সারাবিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ : চার মাযহাব কী বলে?

শরীয়তের মাসাইল দুই প্রকারের : ১. মানসূস আলাইহি ২. মুজতাহাদ ফীহ।

''মানসূস আলাইহি'' বলা হয়, যাতে কুরআন কারীম বা সুন্নতে নববিয়াহর কোনো অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন 'নস' বিদ্যমান থাকে। এ ধরনের মাসাইল 'কতয়ী' (অকাট্য ও সংশয়হীন) হয়ে থাকে এবং অবশ্যই তা 'মুজমা আলাইহি'' (সর্বসম্মত)ও হয়ে থাকে। এ বিষয়ে কোনো ইমাম, ফকীহ, বা আলিমের কোনো মতভেদ থাকে না। যদি কেউ জেনে শুনে দ্বিমত করে তবে তিনি আলিমই গণ্য হবেন না; বরং তার সাথে 'ফাসিক' বিশেষণ যুক্ত হবে।

আর ''মুজতাহাদ ফীহ'' বলা হয়, যাতে হয়তো কোনো নস নেই বা থাকলেও তা হয়তো এমন স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নয়, যাতে একাধিক মর্মের সম্ভাবনা নেই, কিংবা তা প্রামাণিকতার দিক থেকে এমন অকাট্য ও শক্তিশালী নয়, যার ছূবূত ও প্রামাণিকতা হাদীস-বিচারকগণের কাছে সর্বসম্মত। এ ধরনের বিষয়ে ফিকহ-ফতোয়ার ইমামগণ ইজতিহাদের ভিত্তিতে ফয়সালা করেন। এই ফয়সালায় তারা সবাই একমত থাকলে বিষয়টি 'মুজতাহাদ ফীহ' (ইজতিহাদী) হওয়া সত্ত্বেও 'মুজমা আলাইহি' গণ্য হবে। আর তাদের মাঝে মতানৈক্য হলে বিষয়টি হবে 'মুজতাহাদ ফীহ'' এবং 'মুখতালাফ ফীহ''।

''কোথাও চাঁদ দৃষ্টিগোচর হলে যতদূরের অঞ্চলে তা 'তরীকে মুজিবে'র দ্বারা প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হবে সংশ্লিষ্ট অথরিটির জন্য এই 'চাঁদ দেখা' গ্রহণ করা এবং সে অনুসারে ফয়সালা করা জরুরি কি না'' এ বিষয়টি কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তা দেখতে হবে।

কেউ কেউ এই ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে, বিষয়টি 'মানসূস আলাইহি' এবং মোটামুটি 'মুজমা আলাইহি'। এক ভাই তো এ পর্যন্ত লিখে দিয়েছেন যে, শাফেয়ী মাযহাবের একজন আলিম ছাড়া এতে কারো দ্বিমত নেই। সবাই এ বিষয়ে একমত যে, কোথাও চাঁদ দেখা গেলে তা সব জায়গার জন্য 'ওয়াজিবুল আমল' তথা অবশ্য অনুসরণীয়।

অথচ বাস্তবতা এই যে, এ বিষয়টি ''মুজতাহাদ ফীহ'' হওয়ার পাশাপাশি মুখতালাফ ফীহ-ও বটে। আর এক এলাকার চাঁদ দেখা দূর দূরান্তের জন্য অবশ্য অনুসরণীয় না হওয়াই ফকীহগণের অনেক বড় জামাআতের সিদ্ধান্ত। হানাফী মাযহাবেরও বড় বড় অনেক ফকীহ এই নীতি গ্রহণ করেছেন। আর শাফেয়ী মাযহাবে তো এটিই 'মুফতা বিহী'' (ফতোয়া)। তো প্রসঙ্গটি একটু বিস্তারিত বর্ণনা করা সমীচীন মনে হচ্ছে।

এ মাসআলা মুখতালাফ ফীহ

ইতিপূর্বে আরজ করেছি যে, এ বিষয়টি যেমন 'মুজতাহাদ ফীহ' (ইজতিহাদী) তেমনি 'মুখতালাফ ফীহ' (ইখতিলাফী)ও বটে। এমনকি চার মাযহাবের প্রত্যেকটির ফকীহগণের মাঝেও এ বিষয়ে ইখতিলাফ রয়েছে।

প্রত্যেক মাযহাবেই উভয় মতের ফকীহ রয়েছেন। ইমাম ও ফকীহগণের মাযহাবের বিবরণ দেওয়ার আগে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার।

এক. আলোচ্য বিষয়ে ইমামগণের ইখতিলাফ মূলত দূর দূরান্তের অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে। কাছাকাছি দুই স্থান বা শহরের মধ্যে এক জায়গার চাঁদ দেখা যদি অন্য জায়গায় ‘তরীকে মুজিবে’র মাধ্যমে পৌঁছে তাহলে তা ‘ওয়াজিবুল আমল’ (অবশ্যগ্রহণীয়) হওয়ার বিষয়ে ইমামগণ একমত। যদিও কোনো কোনো কিতাবের বর্ণনাভঙ্গি ও বর্ণনার শাব্দিক ব্যাপকতার কারণে অনেকে মনে করেছেন, কোনো কোনো ইমামের মতে প্রত্যেক শহরে তা যতই কাছাকাছি হোক না কেন, নিজেদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য। নিকটবর্তী অন্য কোনো শহরের চাঁদ দেখাও তাদের জন্য অবশ্যগ্রহণীয় নয়। এটা ভুল ধারণা। ইমামগণের মূল ইখতিলাফ দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে। কাছাকাছি দুই স্থান বা শহরের ক্ষেত্রে নয়।

একাধিক গবেষক আলিম তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। আমি শুধু একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি।

আল্লামা আবুল হাসানাত আবদুল হাই লাখনোবী রাহ. (১২৬৪ হি.-১৩০৪ হি.)

তিনি তাঁর ‘মাজমূআতুল ফাতাওয়া’য় খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬৮ (খুলাসাতুল ফাতাওয়ার সাথে মুদ্রিত) এ বিষয়টি আলোচনা করেছেন। ফার্সী ভাষায় কৃত তাঁর আলোচনার একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি :

وایں کہ در عوام مشہور است "لكل أهل بلد رويتهم" ازیں ایں مراد نیست کہ مطلقا رویت یکجا در مقام دیگر معتبر نباشد ورنہ لازم خواہد آمد کہ اگر دریك شہر رویت شود ودر دیگر شہر کہ ازاں صرف یکدو منزل یا دو چار میل دور باشد رویت نشود پس آں رویت در حق مردمان دیگر شہر معتبر بناشد وایں امر ہیچ عاقل کہ اور اورا از کتب حدیث ممارست وبفن ہیئت مناسبت است تجویز نخواہد کرد، بل لا يقول به إلا جاهل غبي أو غوي ... .

তো কাছাকাছি দুই শহর বা একটি বড় শহর যদি এমন হয় যে, ইলমুল ফালাকের বর্ণনা অনুসারে এখানে চাঁদের উদয়স্থল কখনো কখনো আলাদাও হয়ে যায় তাহলেও সবাই একমত যে, এক্ষেত্রে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়। বরং এক্ষেত্রে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য (তরীকে মুজিবের মাধ্যমে প্রমাণিত হলে) অবশ্যগ্রহণীয়।

কাছাকাছি এলাকার ক্ষেত্রে এক জায়গার চাঁদ দেখার সাক্ষ্য অন্য জায়গার জন্য কবুল করা মারফূ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত, উম্মাহর আমলে মুতাওয়ারাছ (প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসা ব্যাপক কর্মধারা) দ্বারাও প্রমাণিত। বাস্তবে এ বিষয়ে কোনো ইখতিলাফ নেই। শুধু কিছু বাক্যের শাব্দিক ব্যাপকতা থেকে ইখতিলাফ ধারণা করা হয়েছে।

আনাস রা.-এর পুত্র আবু উমাইর বলেন, আমাকে আমার আনসারী চাচাগণ, যারা সাহাবী ছিলেন, হাদীস বর্ণনা করেছেন যে-

قالوا : أغمي علينا هلالُ شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناسَ أن يُفْطِروا ويَخْرُجُوا إلى عيدهم من الغد.

একবার মেঘের কারণে শাওয়ালের চাঁদ আমাদের দৃষ্টিগোচর হল না। ফলে পরদিন আমাদের সকাল হল (রমযানের ত্রিশতম) রোযা অবস্থায়। দিনের শেষে এক কাফেলা এল এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

কাছে সাক্ষ্য দিল যে, তারা গত রাতে চাঁদ দেখেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের আদেশ করলেন, এখন রোযা ভেঙ্গে ফেল আর আগামীকাল ঈদের জন্য বের হও। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৫৫৪; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস : ৭৩৩৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৫৩; আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী খ. ৩, পৃ. ৩১৬; খ. ৪, পৃষ্ঠা ২৪৯)

ইমাম বায়হাকী রাহ. প্রথম জায়গায় এ হাদীসের সনদকে সহীহ আর দ্বিতীয় জায়গায় 'হাসান' বলেছেন। সর্বাবস্থায় তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। শব্দের কিছু পার্থক্যের সাথে এ হাদীস সুনানে আবু দাউদ (১১৫০), সুনানে নাসায়ী (১৭৫৬), মুসনাদে আহমদ খ. ৫, পৃ. ৫৭, ৫৮) ও সহীহ ইবনে হিববানেও (৩৪৫৬) আছে।

এ হাদীস থেকে সাধারণভাবে এটাই বোঝা যায় যে, এই কাফেলা মদীনা থেকে অন্তত এক দিনের দূরত্বে থাকা অবস্থায় চাঁদ দেখেছে। তারা যদি রাতেও সফররত থেকে থাকেন তাহলে অন্তত দেড় দিনের দূরবর্তী স্থান থেকে মদীনায় পৌঁছেছেন। অর্থাৎ তাঁরা সম্ভবত পঁচিশ-ছাবিবশ মাইল দূরের এলাকায় চাঁদ দেখে থাকবেন। বোঝা গেল, কাছাকাছি এলাকাসমূহে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য অবশ্যগ্রহণীয়। প্রতি যুগে উম্মাহর সম্মিলিত কর্মও এরূপই ছিল। ইমামগণের মাঝে যে ইখতিলাফ হয়েছে তা দূরবর্তী অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রেই হয়েছে।

তবে যদি দুই অঞ্চলের মাঝের দূরত্ব এতো বেশি হয় যে, উভয় জায়গার মাঝে সময়ের ব্যবধানও খুব বেশি। যার ফলে সহজ-স্বাভাবিকভাবে এক জায়গার চাঁদ দেখা অনুযায়ী অন্য জায়গায় আমল করা সম্ভব হয় না। এ ধরনের ক্ষেত্রেও কি এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য হওয়ার বিষয়টি ইখতিলাফী? কেউ কেউ এমনটি ধারণা করে থাকলেও একাধিক গবেষক আলিমের মতে, এক্ষেত্রে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য অবশ্যগ্রহণীয় না হওয়া ইজমায়ী ও সর্বসম্মত। যথাস্থানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

দুই. মাযহাবসমূহের বিবরণে যাওয়ার আগে যে দুই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছি তার দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, যে দূরবর্তী অঞ্চলসমূহের মাঝে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য ধর্তব্য হওয়ার ক্ষেত্রে ইমামগণের মাঝে ইখতিলাফ আছে এ ধরনের একাধিক অঞ্চল যদি একই প্রশাসক বা বিচারক (কিংবা স্বীকৃত হেলাল কমিটির) অধীনে থাকে এবং সেখানে কোনো এক জায়গায় চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার ভিত্তিতে গোটা অঞ্চলের জন্য চাঁদের ফয়সালা করে দেওয়া হয় তাহলে আলিমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ অঞ্চলগুলোর সকল অধিবাসীর জন্য ঐ চাঁদ দেখা অনুসরণ করা জরুরি।

এ সিদ্ধান্ত ঐ আলিমগণেরও, যারা দূরবর্তী শহরনগরের ক্ষেত্রে ইখতিলাফুল মাতালি (চাঁদের উদয়স্থলের বিভিন্নতা) গ্রাহ্য করেন এবং মনে করেন এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য ধর্তব্য নয়।

আল্লাহ তাআলার তাওফীক হলে এ দিকটি নিয়েও বিস্তারিত ও দালীলিক আলোচনার ইচ্ছা আছে। এখানে শুধু ইঙ্গিত করাই উদ্দেশ্য, যাতে সামনে বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা না হয়।

মাযহাবসমূহের বিবরণ

মাযহাবের বিবরণ সাহাবা-যুগ থেকে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা সঙ্গত মনে হচ্ছে।

সাহাবা-যুগ

শতবর্ষব্যাপী সাহাবা-যুগ, যাতে খিলাফতে রাশিদার ত্রিশ বছরের সোনালী আমলও অন্তর্ভুক্ত, (যাকে খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ্র আমল বলে) তাতে এ রীতিই অনুসৃত ছিল যে, প্রত্যেক এলাকার অধিবাসীগণ নিজ নিজ চাঁদ দেখা অনুসরণ করতেন। কাছাকাছি জায়গা থেকে কোনো নির্ভরযোগ্য শাহাদত (সাক্ষ্য) এসে গেলে তা-ও গ্রহণ করা হত, কিন্তু অন্য জায়গা থেকে শাহাদত সংগ্রহ করা কিংবা অন্যান্য জায়গায় শাহাদত পাঠানো বা শাহাদতের ভিত্তিতে দারুল খিলাফায় (রাজধানীতে) যে ফয়সালা হয়েছে তা অন্য অঞ্চলে পাঠানোর কোনো আয়োজন করা হত না। হাদীস-সীরাত ও তারীখের কিতাবে এর একটি নজিরও আমাদের চোখে পড়েনি। কেউ যদি কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে নির্ভরযোগ্য সনদে নবী-যুগ বা খিলাফতে রাশিদা-যুগের এমন কোনো নজির দেখিয়ে দেন তাহলে আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

ঐ যুগের সাধারণ অবস্থা অনুসারে দূর-দূরান্তের অঞ্চল থেকে চাঁদের খবর পাওয়ার কথা চিন্তাই করা যেত না। কিন্তু কুদরতের কারিশমা, সাহাবা-যুগে ঘটনাচক্রে সংঘটিত এমন একটি ঘটনা হাদীসের কিতাবে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমদসহ হাদীসের অনেক কিতাবে তা সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, শামে চাঁদ দেখার সংবাদ মদীনাবাসী জানতে পেরেছেন। শাম (দামেশক) মদীনা থেকে স্থলপথে ১৯২৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আর দামেশক ৩৩° উত্তর অক্ষাংশে, ৩৬° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এবং মদীনা ২৪° উত্তর অক্ষাংশে, ৩৯° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

ঘটনাটি এই যে, তাবেয়ী কুরাইব ইবনে আবী মুসলিম (৯৮ হি.)-কে উম্মুল ফযল বিনতুল হারিছ কোনো কাজে মুয়াবিয়া রা.-এর কাছে শামে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাঁর কাজ সমাপ্ত করলেন। ইতিমধ্যে শামে রমযানের চাঁদ দেখা গেল এবং জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে) চাঁদ দেখা গেল এবং জুমাবার থেকে রোযা শুরু হল। কুরাইব মাসের শেষের দিকে মদীনায় পৌঁছলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা., যিনি ছিলেন কুরাইবের মাওলা, কথাপ্রসঙ্গে কুরাইবকে জিজ্ঞাসা করলেনওতোমরা কবে চাঁদ দেখেছঽ কুরাইব বললেনওজুমা-রাতে।’ ইবনে আববাস রা. জিজ্ঞাসা করলেনওতুমি নিজে দেখেছঽ তিনি বললেনওহাঁ, আমিও দেখেছি, অন্যরাও দেখেছেন। সবাই রোযা রেখেছেন। মুয়াবিয়া রা.-ও (ঐ সময়ের আমীরুল মুমিনীন) রোযা রেখেছেন।’ আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. বললেন,

لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين، أو نراه

'কিন্তু আমরা তো শনিবার রাতে (শুক্রবার দিবাগত রাতে) চাঁদ দেখেছি। অতএব আমরা আমাদের হিসাবমত ত্রিশ রোযা পুরা করব, তবে যদি (২৯ তারিখ দিবাগত রাতে) চাঁদ দেখি সেটা আলাদা কথা।'

কুরাইব জিজ্ঞাসা করলেন-

أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه

'আপনি কি মুয়াবিয়া রা.-এর চাঁদ দেখা ও রোযা রাখাকে যথেষ্ট মনে করবেন না?

আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. বললেন-

لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

'না, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ আদেশই করেছেন।'

(সহীহ মুসলিম ১০৮৭; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৭৮৯; জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৩৩২; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৬৯৩; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২১১১)

এ ঘটনা সম্পূর্ণ পরিষ্কার। কুরাইব একজন তাবেয়ী ও ছিকা (বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য) ব্যক্তি এবং আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর অতি ঘনিষ্ট। আর আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর কাছে রমযান সম্পর্কে এক ব্যক্তির সংবাদই যথেষ্ট। তিনি নিজেই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রমযানের চাঁদের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বেদুঈনের (আ'রাবীর) সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন (বায়হাকী খ. ৩, পৃ. ২১১-২১২)।

আর কুরাইব শুধু নিজের চাঁদ দেখার সংবাদ দেননি, আমীরুল মুমিনীনের নিকট চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়া ও তা কার্যকর হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন।

যাই হোক, এ সংবাদের উপর নির্ভর করে এই ফয়সালা করা যে, রমযান মূলত জুমাবারেই শুরু হয়েছে। আমরা চাঁদ দেখিনি এবং যথাসময়ে অন্য জায়গার চাঁদ দেখার সংবাদও পাইনি। এ কারণে আমাদের একটি রোযা কাযা হয়ে গেছে। কুরাইবের সংবাদের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা ছিল না। ইবনে আববাস রা.কে যদি দূরবর্তী অঞ্চলের এই চাঁদ দেখা গ্রহণ করতে হত তাহলে মাসআলার দিক থেকে তা গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্য কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি; বরং বলেছেন-

هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমনই আদেশ করেছেন।

এখন এটা আলাদা বিষয় যে, আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর কাছে এ বিষয়ে (দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখা ধর্তব্য হওয়া না হওয়া) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ ও নির্দেশনা ছিল, না তিনি এর দ্বারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ বাণীর দিকেই ইঙ্গিত করেছেন, যা তাঁর মতো আরো অনেক সাহাবী বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ যে বাণীতে (তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা ছাড়) এর নির্দেশ রয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. বলেন-

إني لأعجب من هؤلاء الذين يصومون قبل رمضان، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فعُدُّوا ثلاثين.

ঐ সকল লোকের উপর আমার আশ্চর্য হয়, যারা রমযান আসার আগেই রোযা রাখতে শুরু করে। আল্লাহর রাসূল সাললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন, যখন তোমরা চাঁদ দেখবে তখন রোযা রাখবে এবং যখন (দ্বিতীয়) চাঁদ দেখবে তখন রোযা ছাড়বে। চাঁদ যদি আড়ালে থাকে তাহলে ত্রিশ সংখ্যা পূর্ণ করবে। (আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী ৪/২০৭)

আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. এ-ও বর্ণনা করেছেন-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين، إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين.

তোমরা একটি বা দুটি রোযার দ্বারা (রমযান) মাসের চেয়ে অগ্রগামী হয়ো না। তবে যদি তোমাদের কারো (অভ্যাসগত নফল) রোযার দিবস হয়, যা সে আগে থেকে রেখে আসছে তাহলে আলাদা কথা। আর তোমরা চাঁদ দেখার আগে রোযা রাখবে না এবং (দ্বিতীয়) চাঁদ দেখা পর্যন্তই রোযা রাখবে। যদি মেঘের কারণে চাঁদ দেখা না যায় তাহলে ত্রিশ সংখ্যা পূর্ণ করবে। (আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী ৪/২০৭)

আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর কাছে যদি এ বিষয়ে (দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখা অবশ্যগ্রহণীয় না হওয়ার বিষয়ে) কোনো সুস্পষ্ট বাণী না-ও থেকে থাকে এবং তিনি 'রাসূলের আদেশ' বলে উপরোক্ত হাদীসের প্রতিই ইঙ্গিত করে থাকেন, তবুও তো এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

(তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ চাঁদ দেখে রোযা ছাড়।) শীর্ষক হাদীসের এই অর্থই বুঝেছেন যে, এ হাদীসে নিজ এলাকা ও নিকটবর্তী এলাকার চাঁদ দেখা উদ্দেশ্য। দূরবর্তী এলাকার চাঁদ দেখা উদ্দেশ্য নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর এ অনুধাবনের সাথে কোনো মুজতাহিদ ইমামের যদি দ্বিমত থাকে তবে থাকতে পারে, কিন্তু এর দ্বারা দুটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে সামনে আসে :

এক. صوموا لرؤيته শীর্ষক হাদীসের এ ব্যাখ্যাই নির্ধারিত নয় যে'যেখানেই চাঁদ দেখা যাক তোমরা রোযা শুরু কর, দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখাও তোমাদের জন্য অবশ্যগ্রহণীয়।' কারণ আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. একজন ফকীহ সাহাবী এবং তিনি নিজে ঐ হাদীস আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, কিন্তু তিনি এর ঐ অর্থ বোঝেননি।

দুই. আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর মাযহাব এই ছিল যে, দূরবর্তী এলাকার চাঁদ দেখা অবশ্যগ্রহণীয় নয়; নিজ এলাকার চাঁদ দেখাই আমলযোগ্য।

এখন তো আমি মাযহাবই বর্ণনা করছি। তো সাহাবা-যুগে আমরা সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর এই মাযহাব পেলাম যে, তিনি দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখা ধর্তব্য মনে করেননি। আর এ বিষয়ে অন্য কোনো সাহাবী তাঁর সাথে দ্বিমত করেছেন এমন তথ্য আমাদের জানামতে হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়নি।

ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. (৩৬৮-৪৬৩ হি.) মুয়াত্তা মালিকের ভাষ্যগ্রন্থ ''আততামহীদ'' কিতাবে এ বিষয়ে ইমামগণের মাযহাব বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথম মত এই উল্লেখ করেছেন যে, অন্য এলাকার চাঁদ দেখা অবশ্যগ্রহণীয় নয়। তিনি লেখেন, এটাই আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (সাহাবী) (৬৮ হি.), ইকরিমা (১০৭ হি.), কাসিম বিন মুহাম্মাদ (১০৭ হি.) ও সালিম বিন আবদুল্লাহ (১০৬ হি.) (এই তিনজন তাবেয়ী)-এর মাযহাব। এবং ইসহাক ইবনে রাহূয়াহও (২৩৮ হি.) এ কথাই বলেছেন। এরপর ইবনে আবদুল বার দ্বিতীয় মাযহাব বর্ণনার পর স্পষ্ট ভাষায় লেখেন,

إلى القول الأول أذهب، لأن فيه أثرا مرفوعا، وهو حديث حسن تلزم به الحجة

আমি প্রথম মতই গ্রহণ করি। কারণ এর সমর্থনে একটি মারফূ হাদীস আছে, যা সনদের বিচারে দলীলযোগ্য। আর তা এক বড় সাহাবীর মাযহাব। সাহাবীদের মধ্যে কেউ এ বিষয়ে তার বিরোধিতা করেননি। পাশাপাশি এটি ফকীহ-তাবেয়ীগণের একটি জামাতেরওসিদ্ধান্ত। (আততামহীদ খ. ১৪, পৃ. ৩৫৬-৩৫৮, নাফে-এর সূত্রে বর্ণিত চল্লিশতম হাদীসের আলোচনায়)

সারকথা এই যে, সাহাবা-যুগে দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখা 'অবশ্যগ্রহণীয়' না হওয়ার বিষয়ে এক বড় ফকীহ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর মাযহাব পাওয়া গেল। এর বিপরীতে অন্য কোনো সাহাবীর কোনো কথা পাওয়া যায়নি।

তাবেয়ী-যুগ

কিছু আগে ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ.-এর বরাতে বলা হয়েছে, তাবেয়ীদের মাঝে ইকরিমা, কাসিম ও সালিম রাহ.-এর মাযহাব তা-ই ছিল, যা ছিল সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর মাযহাব। 'আততামহীদ' ছাড়া মুয়াত্তার দ্বিতীয় শরহ (ভাষ্যগ্রন্থ) 'আলইসতিযকারে'ও তিনি ঐ তাবেয়ীগণের মাযহাব উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্যের আরবী পাঠ এই-

وبه قال عكرمة، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وإليه ذهب ابن المبارك، وإسحاق بن راهوية، وطائفة.

''এটিই ইকরিমা, কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ও সালিম ইবনে আবদুল্লাহর বক্তব্য। ইবনুল মুবারক ও ইসহাক ইবনে রাহূয়াহসহ একটি জামাতের মাযহাবও এটিই।'' (আলইসতিযকার ১০/২৯)

ইকরিমা (২৫-১০৫ হি.) তো আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর খাস শাগরিদ, বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ।

কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (৩৭-১০৭ হি.) আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর পৌত্র। আর সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (১০৬ হি.) ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর পৌত্র। কাসিম ও সালিম এই দুইজন তাবেয়ী-যুগের ঐ সরতাজ সাত ফকীহগণের অন্যতম, যাদের ‘‘আলফুকাহাউস সাবআ’’ বলে স্মরণ করা হয়।

কাসিম রাহ. যে ‘সাত ফকীহ’র একজন এ বিষয়ে তো সবাই একমত। আর সালিম রাহ.ও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ইবনুল মুবারক রাহ.-এর মতে। ফিকহ-ফতোয়ায় ‘‘সাত ফকীহ’’র মতামতের যে বিশেষ মর্যাদা ও বিশেষত্ব সে সম্পর্কে উসূলে ফিকহ ও তারীখে ফিকহের পারদর্শী ব্যক্তিগণ অবগত।

তো এই দুই মনীষীর মাযহাবও এটাই ছিল যে, প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীগণ নিজ নিজ চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করবে, দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখা তাদের জন্য আবশ্যকীয় নয়। এঁদের সাথে তৃতীয় তাবেয়ী ইকরিমা রাহ.-এরও মাযহাব এটাই ছিল।

এই তিন তাবেয়ীর মাযহাব সম্পর্কে একথা আরো অনেক আগে বলেছেন ইবনুল মুনযির রাহ. (৩১৮ হি.) ‘‘ইশরাফ’’ গ্রন্থে (৩/১১২) এবং খাত্তাবী (৩৮৮ হি.) ও বাগাভী (৫১৬ হি.) সহ অন্যান্য গ্রন্থকারগণ।

(দ্র. মাআলিমুস সুনান ২/৮৪, শরহুস সুন্নাহ ৪/১৪৫, আরো দেখা যেতে পারে : আলমুসান্নাফ, ইবনে আবী শাইবা ৬/২৮০ আছার : ৯৬৫৮

(في القوم يرون الإهلال ولا يرونه الآخرون

আমাদের জানা মতে তাবেয়ী-যুগের এই তিন বিশিষ্ট মনীষীর বিপরীতে অন্য কোনো তাবেয়ীর ফতোয়া বিদ্যমান নেই। শুধু হাসান বসরী (২১ হি.-১১০ হি.) রাহ. থেকে এমন একটি রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, যা এই মাযহাবের বিপরীত ধারণা করা হতে পারে। সুনানে আবু দাউদের কোনো কোনো নুসখায় (আবুল হাসান ইবনুল আবদ ও ইবনে দাছার বর্ণনাকৃত মাখতূতায়) আছরটি আছে-

عن الحسن، في رجل كان بمصر من الأمصار، فصام يوم الإثنين، وشهد رجلان أنهما رأيا الهلالَ ليلة الأحد، فقال : لا يقضي ذلك اليومَ الرجل ولا أهلُ مصره، إلا أن يعلموا أن أهل مصر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضوه.

হাসান বসরী রাহ. থেকে বর্ণিত, কোনো ব্যক্তি কোনো শহরে ছিল এবং (সেই শহরবাসীদের সাথে) সোমবার রোযা শুরু করল। এরপর দুই ব্যক্তি এসে সাক্ষ্য দিল যে, তারা দুজন রবিবার রাতে (শনিবার দিবাগত রাতে) চাঁদ দেখেছে। (সুতরাং রবিবার থেকেই রোযা শুরু হওয়া উচিত ছিল) এ ক্ষেত্রে হাসান রাহ. বলেছেন, শুধু এটুকুর ভিত্তিতে ঐ ব্যক্তি ও শহরবাসী একটি রোযা কাযা করবে না। তবে তারা যদি জানতে পারে যে, কোনো মুসলিম শহরের অধিবাসীগণ বাস্তবেই রবিবার রোযা রেখেছে তাহলে তারা ঐ দিনের রোযা কাযা করবে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২৩৩৩; তুহফাতুল আশরাফ, হাদীস : ১৮৪৯২)

শব্দের ব্যাপকতা থেকে হাসান বসরী রাহ.-এর ফতোয়ার যদি এ অর্থ করা হয় যে, দূর-দূরান্তের কোনো শহরের অধিবাসীদের বিষয়েও তারা একদিন আগে রোযা রেখেছিল বলে প্রমাণিত হলে এ শহরের অধিবাসীগণকে এক দিনের রোযা কাযা করতে হবে, তাহলে বলা যায়, হাসান বসরী রাহ.-এর মাযহাব ছিল, এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য (যদি প্রমাণিত হয়) অবশ্যগ্রহণীয়।

সারসংক্ষেপ

এ পর্যন্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ এই যে, দূর-দূরান্তের অঞ্চলের চাঁদ দেখা ওয়াজিবুল আমল (অবশ্যগ্রহণীয়) না হওয়ার বিষয়ে সাহাবা-যুগে আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর মাযহাব পাওয়া গেল, এর বিপরীত কিছু কারো থেকে পাওয়া যায়নি। তাবেয়ী-যুগে তিন বড় মনীষী ইকরিমা রাহ., কাসিম রাহ. ও সালিম রাহ. থেকেও এই মাযহাবই পাওয়া গেল। এর বিপরীত বিবরণ শুধু এক হাসান বসরী রাহ. থেকে পাওয়া যায় যদি তাঁর ফতোয়াকে শব্দের ব্যাপকতার উপর রাখা হয়। নতুবা শক্তিশালী সম্ভাবনা আছে, তাঁর উদ্দেশ্য, নিকটবর্তী কোনো শহরে চাঁদ দেখা ও রোযা রাখা প্রমাণিত হলে কাযা আসবে, অন্যথায় নয়।

চার মাযহাবের মুজতাহিদ ও অন্যান্য ফকীহগণের সিদ্ধান্ত

ইমাম তিরমিযী রাহ. (২৭৯ হি.) তার 'জামি' গ্রন্থে কিতাবুস সিয়াম (সিয়াম-অধ্যায়)-এর নবম বাব (পরিচ্ছেদের) শিরোনাম দিয়েছেন-

باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم

(প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য নিজ নিজ চাঁদ দেখা অনুসরণীয় সংক্রান্ত হাদীস) এই শিরোনামের অধীনে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর ঐ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যা 'সাহাবা-যুগ' শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে। এই হাদীস বর্ণনার পর ইমাম তিরমিযী রাহ. লেখেন-

حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، أن لكل أهل بلد رؤيتهم.

ইবনে আববাস রা.-এর উপরোক্ত হাদীস 'সহীহ'। (ইমাম তিরমিযীর বিশেষ পরিভাষায় ''হাসানুন সহীহুন গরীবুন'') এবং আহলে ইলমের (ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের) আমলও এটাই যে, প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য নিজেদের দেখাই গ্রহণযোগ্য। (জামে তিরমিযী ২/২৩২, হাদীস : ৭০২-এর অধীনে)।

ইমাম তিরমিযী রাহ. বিধান সংক্রান্ত হাদীসের অধীনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাদীসের ইমাম ও মুজতাহিদ ফকীহগণের মাযহাব বর্ণনা করে থাকেন। সাহাবা, তাবেয়ীনের মাযহাবের সাথে চার ইমাম, সুফিয়ান ছাওরী ও ইসহাক ইবনে রাহূয়াহ রাহ.-এর মাযহাব বিশেষভাবে বর্ণনা করেন। অথচ আলোচ্য বিষয়ে তিনি কোনো ইখতিলাফই বর্ণনা করেননি। সাধারণভাবে 'আহলে ইলমে'র মাযহাব বর্ণনা করেছেন যে‚প্রত্যেকে নিজ অঞ্চলের চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করবে।' (অর্থাৎ দূর-দূরান্তের শহর-নগরের চাঁদ দেখা অবশ্যগ্রহণীয় নয়) বোঝা গেল, ইমাম তিরমিযী রাহ.-এর দৃষ্টিতে অধিকাংশ ফকীহ ও মুহাদ্দিসের মাসলাক সেটাই, যা তিনি উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এ কারণেই এ বিষয়ে কোনো ইখতিলাফ বর্ণনার প্রয়োজন বোধ করেননি।

ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. সাহাবা-তাবেয়ীনের মাযহাব বর্ণনার পর পরবর্তী ফকীহগণের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হি.) ও ইমাম ইসহাক ইবনে রাহূয়াহ রহা. (১৬১-২৩৮ হি.) এর নাম উচ্চারণ করে বলেছেন যে, এঁদেরও মাসলাক এটাই ছিল। (অর্থাৎ প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য নিজ নিজ চাঁদ দেখাই ধর্তব্য) (আলইসতিযকার ১০/২৯)

ইসহাক ইবনে রাহূয়াহ রাহ.-এর মাসলাক সম্পর্কে আরো দেখুন : আলইশরাফ, ইবনুল মুনযির ৩/১১২; মাআলিমুস সুনান, খাত্তাবী ২/৮৪; শরহুস সুন্নাহ, বাগাভী ৪/১৪৫

এবার চার মাযহাবের ইমাম ও তাঁদের অনুসারী ফকীহগণের মাযহাব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

হানাফী মাযহাব

হানাফী মাযহাব সম্পর্কে মশহূর হয়েছে যে, এই মাযহাবের ''জাহিরুর রিওয়ায়াহ'' হল, 'ইখতিলাফুল মাতালি' (চাঁদের উদয়স্থলের বিভিন্নতা) ধর্তব্য নয়। অর্থাৎ যেকোনো জায়গার চাঁদ দেখা সব জায়গার জন্য 'ওয়াজিবুল আমল' অবশ্যপ্রযোজ্য। এমনকি পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে চাঁদ দেখা গেলেও পূবের লোকদের জন্য তা অবশ্যগ্রহণীয়।

''জাহিরুর রিওয়ায়াহ'' শব্দবন্ধ থেকে মনে করা হয়েছে, এ মাসআলা সরাসরি ইমাম আবু হানীফা রা. থেকে বর্ণিত। অতপর এ ধারণাও করা হয়েছে যে, এটি যখন 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' তখন এর বিপরীতে মাযহাবের অন্যান্য ফকীহ ও মাশাইখের কথা গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত নয়। কারণ 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' তো সব কিছুর উপরে!!

পর্যালোচনা :

এ কথা স্বীকৃত যে, হানাফী মাযহাবের একাধিক কিতাবে চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়াকেই মুফতা বিহী বলা হয়েছে। কেউ কেউ আরো বলেছেন যে, এটিই মাযহাবের অধিকাংশ মাশাইখের মাসলাক। কিন্তু 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' কথাটির বিষয়ে বিনীত নিবেদন এই যে, হানাফী মাযহাবে ঐ সিদ্ধান্ত 'জাহিরুর রিওয়াহ' হওয়ার বিষয়টি সঠিক নয় এবং এ কথাও ঠিক নয় যে, এ মাসআলা (উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয় এবং পশ্চিমের চাঁদ পূবের জন্যও অবশ্যগ্রহণীয়) ইমাম আবু হানীফা রাহ. থেকে সরাসরি বর্ণিত। তদ্রূপ এ ধারণাও ঠিক নয় যে, হানাফী মাযহাবে যায়লায়ী বা আলাউদ্দীন কাসানী ছাড়া এ সিদ্ধান্তের বিরোধী কেউ নেই। বরং হানাফী মাযহাবের অনেক ফকীহ, যারা মাযহাবের মনীষী ব্যক্তিত্ব এবং ফিকহ ও হাদীসে যাঁদের মাকাম যথেষ্ট উঁচু তাঁরা যায়লায়ী ও কাসানীর আগেই ঐ সিদ্ধান্তের বিপরীতে ফতোয়া দিয়েছেন।

আর বাস্তবে হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের আমলও তাঁদেরই ফতোয়ার উপর, ঐ প্রসিদ্ধ মাসলাকের উপর নয়, যাকে 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' মনে করা হয়েছে।

কেন এটি 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' নয়

ফিকহ-ফতোয়ার সাথে সামান্য সম্পর্ক রাখে এমন তালিবে ইলমেরও জানা আছে যে, কোনো মাসআলাকে 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' বলার অর্থ হয়, মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহ.-এর ছয় কিতাবের এক কিতাবে আছে। কিতাবুল আসল (যার আরেক নাম 'আলমাবসূত) আলজামিউস সগীর, আলজামিউল কাবীর, আসসিয়ারুস সগীর, আসসিয়ারুল কাবীর ও আযযিয়াদাত-এই ছয় কিতাবের কোনো কিতাবে আছে। যেহেতু এই কিতাবগুলো ইমাম মুহাম্মদ রাহ. থেকে 'শুহরাত' ও 'ইস্তিফাযা' সূত্রে বর্ণিত এবং মাযহাবের সকল ফকীহ্র কাছে 'মুতালাক্কা বিলকবুল' এবং সাদরে বরণীয় তাই এই কিতাবের মাসআলাসমূহের নাম 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'। অর্থাৎ এই সকল মাসআলা যে বর্ণনা-ধারায় এসেছে, তা শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত এবং ইমাম মুহাম্মাদ (হানাফী মাযহাবের মাসাইলের সংকলক ও আবু হানীফা -আবু ইউসুফের শাগরিদ) থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।

পক্ষান্তরে নাদির রেওয়ায়েত (বহুবচন : নাওয়াদির) বলা হয়, যে মাসআলাগুলো এক দুই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সেই সূত্রগুলো বর্ণনাকারীর বিচারে সহীহ হলেও তা মাশহুরের পর্যায়ে পৌঁছেনি এবং জাহিরুর রিওয়ায়াহ'র মতো 'মুতালাক্কা বিল কবুল'ও হয়নি। এ ধরনের মাসআলাগুলো সাধারণত ''নাওয়াদির'' এবং ''আমালী'' শিরোণামের কিতাবসমূহে পাওয়া যায়।

যাই হোক এখন আমাদের দেখার বিষয় এই যে, আলোচিত মাসআলা (চাঁদের উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়, পশ্চিমের চাঁদ পূবের লোকদের নিকট প্রমাণিত হলে তা অবশ্যগ্রহণীয়) উপরোক্ত ছয় কিতাবে আছে কি না।

আলহামদুলিল্লাহ 'কিতাবুল আসল' তো এখন বারো খন্ডে ছাপা হয়েছে। 'আলজামিউস সগীর' ও 'আলজামিউল কাবীর' আগে থেকেই ছাপা আছে। 'আসসিয়ারুল কাবীর', যা জিহাদের মাসাইল বিষয়ে, আলাদাভাবে আমাদের সামনে নেই, তবে ইমাম সারাখসী রাহ.-এর শরহের মধ্যে একীভূত হয়ে 'শরহুস সিয়ালি কাবীর' নামে মুদ্রিত হয়েছে। তেমনি আযযিয়াদাত' কাযী খানের শরহের মধ্যে একীভূত হয়ে 'শরহু যিয়াদাত' নামে ছেপেছে। থাকল 'আসসিয়ারুস সগীর' (জিহাদের মাসাইলের উপর ছোট কিতাবটি) তো এ কিতাবের মাসাইল 'কিতাবুল আসল' ইমাম মুহাম্মাদ রাহ., ও 'আররাদ্দু আলা সিয়ারিল আওযায়ী', ইমাম আবু ইউসুফ এ বিদ্যমান আছে। সুতরাং এখন যে কোনো আলিম এ মাসআলা উপরোক্ত কিতাবসমূহে তালাশ করতে পারেন। আমরা সবগুলোতেই তালাশ করেছি, কোনো কিতাবে এমন কেনো মাসআলা পাইনি। কোনো ভাই যদি ঐ কিতাবসমূহ থেকে এ মাসআলা বের করে দেন তবে আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

শুধু এই নয় যে, ঐ সকল কিতাবে এ মাসআলা আমরা পাইনি। শুধু এটুকু হলে নিশ্চিতভাবে বলতাম না যে, এ মাসআলা 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' নয়। কারণ হতে পারে, উপরোক্ত কিতাবসমূহের কোনো মাখতূতা (হস্তলিখিত

পান্ডুলিপিতে) এ মাসআলা আছে, যা মুদ্রিত নুসখাসমূহে আসেনি। হতে পারে সেই নির্ভরযোগ্য মাখতূতার ভিত্তিতেই আমাদের পরবর্তী কোনো কোনো ফকীহ এ মাসআলাকে 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' বলেছেন।

এই সম্ভাবনার উপর অনেক চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে। এ কারণে এ মাসআলা ফিকহে হানাফীর প্রাচীন সূত্রগুলোতে তালাশ করা হয়েছে, বিশেষভাবে ঐ কিতাবগুলো বারবার মুতালাআ করা হয়েছে, যা জাহিরুর রিওয়ায়াহর মাসাইল গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করে কিংবা মূলত যা 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর মাসাইল সংকলনের জন্য লেখা হয়েছে। কিন্তু ঐ সকল কিতাবেও এ মাসআলা পাওয়া যায়নি। এবং আবু হানীফা রাহ. আবু ইউসুফ রাহ. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহ. কারো যবানীতেই এমন কোনো কথা আমরা পাইনি যে

لا عبرة لاختلاف المطالع

(উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়)।

আর না তাঁদের কারো উদ্ধৃতিতে এ কথা পেয়েছি যে-

لو رأى أهل المغرب هلال رمضان يجب الصوم على أهل المشرق

(পশ্চিম প্রান্তে চাঁদ দেখা গেলে পুবের লোকদের উপরও রোযা ফরয হয়ে যাবে।) এ ধরনের কোনো কিছুই এসব কিতাবে মাযহাবের মূল ইমামদের বা পূর্ববর্তী কোনো ফকীহর উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায়নি।

উদাহরণস্বরূপ : 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর মাসাইলের জন্য সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য কিতাব হাকিম শহীদ রাহ. (৩৩৪ হি.)-এর 'মুখতাসারুল কাফী' যার ভাষ্য লিখেছেন ইমাম সারাখসী রাহ. 'আলমাবসূতে' যা ত্রিশ খন্ডে প্রকাশিত। আমরা এ মাসআলা সারাখসীর আলমাবসূতেও পাইনি।

'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'র মাসাইলের এক নির্ভরযোগ্য সংকলন ইমাম বুরহানুদ্দীন মাহমুদ বিন সদরুস শরীয়া (৫৫১-৬১৬ হি.)-এর 'আলমুহীতুল বুরহানী''। যা কয়েক বছর আগে বৈরুত থেকে ইদারাতুল কুরআন করাচীর পক্ষ থেকে ২৫ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এ কিতাবের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে লেখক প্রথমে 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর মাসাইল উল্লেখ করেছেন, এরপর 'নাদির রিওয়ায়াত' ও 'ফাতাওয়া মাশাইখ' উল্লেখ করেছেন। ভূমিকায় তিনি বলেছেন-

. ... وجمعت مسائل المبسوط، والجامعين والسير، والزيادات، وألحقت مسائل النوادر والفتاوى والواقعات

আমি এতে মাবসূত (কিতাবুল আসল) দুই জামি (অর্থৎ আলজামিউল কাবীর আলজামিউস সগীর), সিয়ার ও যিয়াদাতের মাসআলাসমূহ একত্র করেছি। এরপর এর সাথে নাওয়াদির, ফাতাওয়া ও ওয়াকিয়াত (ঐ সময়ের নতুন মাসাইল) শ্রেনীর মাসাইল যোগ করেছি ...।' (আলমুহীতুল বুরহানী ১/১৫৯)

তো এ কিতাবেও 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'র বরাতে এ মাসআলা উল্লেখিত হয়নি; বরং এ কিতাবের তৃতীয় খন্ডে (পৃষ্ঠা : ৩৪১) এ বিষয়ের আলোচনাই শুরু হয়েছে এভাবে-

أهل بلدة إذا رأوا الهلال هل يلزم ذلك في حق أهل بلدة أخرى؟ اختلف المشايخ فيه.

কোনো শহরের অধিবাসীরা যখন চাঁদ দেখবে তখন কি তাদের চাঁদ দেখা অন্য শহরের অধিবাসীদের জন্যও অবশ্যগ্রহণীয় হবে? এ বিষয়ে মাশাইখের ইখতিলাফ আছে ...।' তো কথা শুরুই হচ্ছে মাশাইখের বরাতে। এরপর তিনি ইখতিলাফ উল্লেখ করেন, যা সামনে তাঁরই ভাষায় উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এখন শুধু এটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, এ কিতাবে ইমাম মুহাম্মাদের ছয় কিতাবের বরাতে বা 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' শিরোণামে ঐ মাসআলার নাম-নিশানাও নেই, যা হানাফী মাযহাবের 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' বলে মশহূর হয়ে গেছে।

মুখতাসারুত তহাবী (৩২১ হি.), মুখতাসারুল কারখী (৩৪০ হি.) মুখতাসারুল কুদুরী (৪২৮ হি.), বিদায়াতুল মুবতাদী (৫৯৩ হি.) (হেদায়া যার শরহ-ভাষ্যগ্রন্থ), তুহফাতুল ফুকাহা, আলাউদ্দীন সমরকন্দী (৫০৮ হি.)-এ কিতাবগুলোও জাহিরুর রিওয়ায়াহর মাসাইলের বিশেষ সূত্র হিসেবে গণ্য। কিন্তু এসব কিতাবেও এ মাসআলা আমরা পাইনি।

আলমুহীতুল বুরহানীর মতো জাহির রেওয়ায়েতের মাসআলার জন্য রযীউদ্দীন সারাখসী রাহ. (৫৪৪ হি.)-এর কিতাব 'আলমুহীতুর রাযাভী' এবং ইউসুফ ইবনে আলী আল জুরজানী রাহ.-এর কিতাব 'খিযানাতুল আকমাল'ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জানামতে, এই দুই কিতাব এখনো ছাপেনি। তবে আল্লাহর শোকর, এগুলোর মাখতূতা থেকে এই মাসআলা তাহকীক করার তাওফীক আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। তাহকীক দ্বারা জানা গেছে যে, এগুলোতেও এই মাসআলা জাহির রেওয়ায়েতের শিরোণামে বা ইমাম মুহাম্মাদের ঐ ছয় কিতাবের বরাতে নেই।

'খিযানাতুল আকমাল' ফিকহে হানাফীর মাসাইলের গুরুত্বপূর্ণ সংকলন। এর 'মাখতূতা' (হস্তলিখিত পান্ডুলিপি) ইস্তাম্বুলের 'মাকতাবায়ে ফয়যুল্লাহ'য় সংরক্ষিত আছে। ফটোকপি আছে জামেয়া উম্মুল কুরা মক্কা মুকাররমার কুতুবখানায়। আমাকে এ নুসখা সম্পর্কে জানিয়েছেন আমার শাগরিদ মাওলানা তাহমীদুল মাওলা। এরপর আমি

শায়খ ত্বহা হোসাইন ইবনে দানিশকে (মুকীম, মক্কা মুকাররমা) অনুরোধ করি, তিনি যেন এ নুসখা থেকে অন্তত কিতাবুস সওমের অংশ কপি করে পাঠান। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন, তিনি তা পাঠিয়েছেন।

খিযানাতুল আকমালের ভূমিকায় লেখক নিজে এর ধারাবাহিক বিন্যাস উল্লেখ করেছেন যে, প্রথমে তিনি মুখতাসারুল হাকিম শহীদ এর মাসাইল (যা মূলত ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর 'কিতাবুল আসলে'র মাসাইলের সংকলন) উল্লেখ করবেন। অতপর 'আলজামিউল কাবীর' ও 'আল জামিউস সগীর'-এর মাসাইল উল্লেখ করবেন। এরপর হাসান বিন যিয়াদ এর 'আল মুজাররাদ'ও'আল মুনতাকা'ও'আল কারখী' 'শরহুত তহাবী', উয়ূনুল মাসাইল, আবুল লাইছের 'মুখতালিফ' আল খাস্সাফের 'আদাবুল কাযী' আন নাতিফির 'আল আজনাস'ও'আররওযা' ও 'আল ফাতাওয়া', ফাতাওয়াল বাক্কালী, ফাতাওয়া আবিল লাইছ ও ফাতাওয়াল কাযী সায়িদ-এর মাসাইল উল্লেখ করবেন।

ভূমিকার শেষে এ-ও লিখেছেন যে, এ কিতাব লেখা শুরু হয়েছে ৫২২ হি. ঈদুল আযহার দিন।

এই সমৃদ্ধ ও বরকতপূর্ণ কিতাব থেকে সাওমের অংশ পাঠ করলাম কিন্তু এতে ঐ দুটি কথা (উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় বা পশ্চিমের চাঁদ দেখা পূর্বের অধিবাসীদের জন্য অবশ্য অনুসরণীয়) না জাহিরুর রিওয়ায়াহর কোনো কিতাবের উদ্ধৃতিতে, না নাদির রেওয়ায়েতের কোনো কিতাবের উদ্ধৃতিতে আছে, না উল্লেখিত অন্য কোনো কিতাবের বরাতে।

এই বাস্তবতা সামনে রেখে চিন্তা করলে খুব সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে'উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়' বা 'পশ্চিমের চাঁদ দেখা পূর্বের অধিবাসীদের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয়' এই দুই কথার কোনোটি না জাহির রেওয়ায়েতের কিতাবসমূহে আছে, না নাদির রেওয়ায়েতের কিতবাসমূহে,আর না খিযানাতুল আকমালের ভূমিকায় উল্লেখিত বুনিয়াদী কিতাবসমূহে। তদ্রূপ না তা আছে তহাবীর আলমুখতাসার' বা তার শরাহ-গ্রন্থে,আর না কারখীর কিতাবে।

''খিযানাতুল আকমলে'র একটি নুসখা হিন্দুস্তানের মাকতাবায়ে রেযা রামপুরেও আছে। দারুল উলূম দেওবন্দের তালিবে ইলম মাওলানা মোশতাক আহমাদ আমার অনুরোধে রামপুর সফর করে এ মাখতূতা দেখেছেন এবং সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাগুলো আমার জন্য সংগ্রহ করেছেন। তাতেও এ ধরণের কোনো কথা নেই।

এবার 'আলমুহীতুর রাযাভী'র কথা শুনুন। এ কিতাবের আরেক নাম 'মুহীতুস সারাখসী'। এর একটি মাখতূতা করাচীর প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা আহসানুল উলূম গুলশান ইকাবলের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক হযরত মাওলানা যারওয়ালী খান ছাহেবের কুতুবখানায় আছে। জামেয়াতুর রশীদ করাচীর উস্তাজ মাওলানা জহীরুদ্দীন বাবর ছাহেব আমার

অনুরোধে এ মাখতূতার সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাগুলোর নকল আমার জন্য পাঠিয়েছেন। এতেও একই অবস্থা। 'উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়া' বা পশ্চিমের চাঁদ পূবের লোকদের জন্যও অবশ্যঅনুসরণীয় হওয়া' কোনো কথাই না জাহিরুর রিওয়ায়াহর বরাতে আছে, না নাদির রেওয়ায়েতের বরাতে।

সারকথা দাড়াচ্ছে, জাহির রেওয়ায়েতের ছয় কিতাবে বা পরের যে সকল কিতাবে জাহির রেওয়ায়েতের মাসাইল সংকলন হয়েছে, তার কোনোটিতেই আমার জানা মতে 'উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়', বা পশ্চিমের চাঁদের কারণে পূবের লোকদের উপর রোযা ওয়াজিব হবে, এ ধরণের কোনো কথা নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ কথাগুলোকে 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর মাসআলা কে বলেছেন, কীভাবে বলেছেন -এ বিষয়টিই আগামী শিরোণামগুলোর বিষয়বস্তু।

'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' প্রসঙ্গ কীভাবে এল

অনুসন্ধানে যদ্দূর জানা গেছে, এ কথা সর্বপ্রথম (আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন) আল্লামা তাহির ইবনে আহমদ ইবনে আবদুর রশীদ আলবুখারী রাহ.-এর কিতাব 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া' থেকে শুরু হয়েছে। ওখান থেকে আল্লামা হাসান বিন মানসূর কাযী খান রাহ. তাঁর 'ফাতাওয়া'য় নিয়েছেন (যা খানিয়া নামে প্রসিদ্ধ)। এরপর এ দুজনের উপর নির্ভর করে পরের অনেক মুসান্নিফ এ কথা লিখেছেন। কেউ তাদের বরাত দিয়েছেন, কেউ দেননি। এভাবেই কথাটি মশহূর হয়ে গেছে।

তাহির বিন আহমদ বিন আবদুর রশীদ রাহ.-এর জন্ম ও মৃত্যুসন 'আততাবাকাতুছ ছানিয়্যা' এবং এর বরাতে 'আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহর' (২/২৭৬) হাশিয়ায় উল্লেখিত হয়েছে। তাঁর জন্ম ৪৮১ বা ৪৮২ হিজরীতে আর মৃত্যু ৫৪২ হিজরীতে। কাশফুয যুনূনে (খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭০৩) তাঁর কিতাব 'খিযানাতুল ওয়াকিয়াত'' এর আলোচনায় তাঁর মৃত্যুসন ৫৪২ হিজরীই লেখা হয়েছে।

কাযী খান রাহ. ছিলেন ছাহিবে হিদায়ার সমসাময়িক। ছাহিবে হিদায়ার জন্ম ৫১১ হিজরীতে, মৃত্যু ৫৯৩ হিজরীতে। কাযী খান রা.-এর মৃত্যুসন তো ঐতিহাসিকগণ ৫৯২ হিজরী লিখেছেন, কিন্তু জন্মসন উল্লেখ করেননি। অনুমান করা যায়, তার জন্মও ৫১০ হি. থেকে ৫২০ হিজরীর মধ্যেই হবে।

আলফাওয়াইদুল বাহিয়্যা (পৃষ্ঠা : ৮৪) অনুযায়ী কাফাভী রাহ. ‘কাতাইবু আলামিল আখবার’’ গ্রন্থে লিখেছেন যে, তাহির ইবনে আহমদ ইবনে আবদুর রশীদ রাহ. কাযী খান থেকে ইলম হাসিল করেছেন। এটা অসম্ভব নয়। বড় ছোটর থেকে, সমবয়সী সমবয়সী থেকেও ইলম গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু উপরোক্ত সন-তারিখ সামনে রাখলে এই ধারণা সমর্থন করা কঠিন হয় যে, কাযী খান ‘খুলাসা’ লেখকের উস্তাজ! ‘খুলাসাতুল ফাতাওয়া’ ও ফাতাওয়া কাযী খান মিলিয়ে পড়লে অনুমিত হয়, কাযী খানের সামনে ‘খুলাসাতুল ফাতাওয়া’ ছিল এবং তিনি ঐ কিতাবের বিন্যাস ও উপস্থাপনা থেকেও ফায়দা হাসিল করেছেন। যাই হোক, তাঁদের মধ্যে যেই-যার থেকে গ্রহণ করে থাকুন, ইখতিলাফে মাতালি (উদয়স্থলের বিভিন্নতা) ধর্তব্য না হওয়াকে যে হানাফী মাযহাবের ‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’ বলা হয়েছে সেটা একজন অপরজনের উপর নির্ভর করেই লিখেছেন। আর পরের অনেক লেখক এই দুজনের উপর বা তাদের কোনো একজনের উপর নির্ভর করে লিখেছেন। উপরের কিতাবসমূহ খুলে এবং সরাসরি ‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’র ছয় কিতাব দেখে বরাত পরীক্ষা করার সুযোগ হয়নি বা তার প্রয়োজন বোধ করেননি। মোটকথা, এ এক ‘তাসামুহ’ (ভ্রম)। প্রকৃত অবস্থা জানার পর একে বুনিয়াদ বানানো মুনাসিব নয়।

‘খুলাসাতুল ফাতাওয়া’র আরবী পাঠ এই-

ولو صام أهل بلدة ثلثين يوما للرؤية، وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوما للرؤية، فعليهم قضاء يوم، ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية، وعليه فتوى الفقيه أبي الليث، وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني، قال : لو رأى أهل المغرب هلالَ رمضان يجب الصوم على أهل المشرق، وفي التجريد : اعتبر اختلاف المطالع.

কোনো শহরের অধিবাসীগণ যদি চাঁদ দেখে ত্রিশদিন রোযা রাখে আর অপর শহরের অধিবাসীগণ চাঁদ দেখে উনত্রিশ রোযা রাখে তাহলে তাদেরকে একটি রোযা কাযা করতে হবে, আর চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়, জাহিরুর রিওয়ায়াহ অনুসারে। এরই উপর ফকীহ আবুল লাইছের ফতোয়া। আর এরই ফতোয়া দিতেন শামসুল আইম্মা হালওয়ানী। তিনি বলেন, পশ্চিমের অধিবাসীগণ যদি রমযানের চাঁদ দেখে তাহলে পূবের অধিবাসীদের উপর রোযা ওয়াজিব হয়। আর তাজরীদে আছে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য হবে। (খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৪৯)

আর খানিয়ায় এভাবে লেখা

ولو صام أهل بلدة ثلاثين يوما للرؤية، وأهل بدلة أخرى تسعة وعشرين يوما للرؤية، فعلم من صام تسعة وعشرين يوما فعليهم قضاء يوم، ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية، وكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى.

(আলখানিয়া ১/১৯৮, ফাতাওয়া আলমগীরীর সাথে মুদ্রিত নুসখা)

উভয় ইবারতে ভালোভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে:

ক. খুলাসা, খানিয়া দুই কিতাবেই কথা শুরু হয়েছে এই মাসআলা থেকে যে, যে শহরের অধিবাসীরা ২৯ রোযা রেখেছেন তাদের কাছে যদি প্রমাণিত হয় যে, অন্য শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ৩০ রোযা রেখেছেন তাহলে ২৯ রোযাওয়ালাদের উপর এক রোযা কাযা করা জরুরি হবে। যারা ইবারতের অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে ত্বরা করেন তারা খুলাসা-খানিয়ার ইবারত থেকে এ ধারণাও করতে পারেন যে, লেখকদ্বয় এ মাসআলাকেও 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' -এর মাসআলা বলেছেন। অথচ তা নয়। ঐ ইবারতে في ظاهر الرواية কথাটিকে এ মাসআলার সাথে যুক্ত মনে করা ভিত্তিহীন। আর বাস্তবতাও এই যে, মাসআলাটি 'নাওয়াদির' (নাদির রেওয়ায়েত)-এর‌জাহিরুর রিওয়ায়াহ' -এর নয়। বিষয়টি সামনে বরাতসহ আসছে।

খ. নাদির রেওয়ায়েতের এ মাসআলায় এ কথার উল্লেখ নেই যে, দূরে দূরের দুই শহরের ক্ষেত্রে এই বিধান, না কাছাকাছি দুই শহরের ক্ষেত্রে। ফিকহে হানাফীর একাধিক নির্ভরযোগ্য কিতাবে ও বড় বড় অনেক ফকীহের বক্তব্যে একথার উল্লেখ আছে যে, এ বিধান কাছাকাছি অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে, দূরে দূরের শহর-নগরের ক্ষেত্রে নয়। সামনে পাঠক তাদের ঐ উদ্ধৃতিগুলো দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

গ.ولا عبرة لاختلاف المطالع

(উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়)-এ বাক্য নাদির রেওয়ায়েতের এ মাসআলায়ও নেই। এটি খুলাসা-খানিয়ার লেখকদ্বয়ের নিজস্ব বাক্য যা তাঁরা 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' -এর দিকে সম্বন্ধ করেছেন। তারা যেন বলতে চাচ্ছেন, এ বাক্য ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. -এর ছয় কিতাবের কোনো কিতাবে আছে। অথচ বাস্তবতা এই যে, এ বাক্যের সম্বন্ধ 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর দিকে করা একান্তই 'তাসামুহ' (ভ্রম)। ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. এর ছয় কিতাবের কোনো কিতাবেই এর খোঁজ পাওয়া যায় না। আর এই মূলনীতি শ্রেণীর বাক্য

ولا عبرة لاختلاف المطالع

(উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়) তো দূরের কথা, উপরের মাসআলাটিই (২৯ রোযাওয়ালাদের উপর ৩০ রোযাওয়ালাদের কারণে এক রোযা কাযা করার বিধান) 'নাওয়াদির' শ্রেণীর। 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'য় এরো কোনো অস্তিত্ব নেই।

ঘ. খুলাসায় যে বলা হল-

وعليه فتوى الفقيه ابي الليث

এ বাক্যের স্বাভাবিক অর্থ, ত্রিশ ওয়ালাদের কারণে উনত্রিশ ওয়ালাদের এক রোযা কাযা করার ফতোয়া ফকীহ আবুল লাইছও দিয়েছেন। খুলাসা লেখক আবুল লাইছ রাহ.-এর দিকে এ ফতোয়ার সম্বন্ধ হয়ত এই জন্য করেছেন যে, তিনি ''উয়ূনুল মাসায়িল'' কিতাবে নাদির রেওয়ায়েতের ঐ মাসআলা নকল করে মৌনতা অবলম্বন করেছেন, কোনো বিপরীত মন্তব্য করেননি। ''উয়ুনুল মাসাইলে'' আছে

وقال أبو يوسف في الأمالي : لو أن أهل بلدة صاموا للرؤية تسعة وعشرين يوما، وأهل بلد ثلاثين يوما للرؤية، فعلى من صام تسعة وعشرين يوما قضاء يوم.

আবু ইউসুফ রাহ. 'আল-আমালী' গ্রন্থে বলেছেন, কোনো শহরের অধিবাসীরা যদি চাঁদ দেখে ২৯ রোযা রাখে, আর অন্য শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখেই ত্রিশ রোযা রাখে তাহলে ২৯ ওয়ালাদেরকে একটি রোযা কাযা করতে হবে। (উয়ূনুল মাসাইল পৃ.৩৮)

'আল-আমালী' কিতাবটি নাদির রেওয়ায়েতের কিতাবসমূহের মধ্যে গণ্য। আবুল লাইছ রহ. নাদির রেওয়ায়েতের এ মাসআলাটি বর্ণনা করেছেনমাত্র। তার আরো দুইটি কিতাব 'খিযানাতুর রিওয়ায়াহ' ও 'মুখতালিফুর রিওয়ায়াহ' ও মুদ্রিত। সেগুলোতে তো এ মাসালাটিও নেই, (উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়)-শীর্ষক বাক্য তো দূরের কথা।

ঙ. শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (৪৪৮ হি.) -এর ফতোয়ার প্রকৃত পাঠ সম্ভবত সেটাই যা 'আলমুহীতুল বুরহানী'র বরাতে সামনে আসছে। তাঁর উদ্ধৃতিতে ''খুলাসায়'' আলোচ্যস্থানে একথাও আছে যে,‘পশ্চিমের লোক রমযানের চাঁদ দেখলে পূবের লোকদের উপর রোযা ওয়াজিব হয়ে যাবে।' খুলাসার এ বর্ণনা দ্বারা জানা গেলো, এই বাক্য শামসুল আইম্মা হালওয়ানী-এর নিজের। এটি না জাহির রেওয়ায়েতের, না নাদির রেওয়ায়েতের আর না তাঁর আগের কোনো হানাফী আলিমের বরাতে তিনি একথা বলেছেন। সুতরাং ফাতহুল কাদীরে (২/২৪৩) যে একথাকেই 'জাহিরুল মাযহাব' (হানাফী মাযহাবের জাহির রেওয়ায়েত) লেখা হয়েছে তা 'তাসামুহ'।

চ. খানিয়ার ইবারত

وكذا ذكر شمس الائمة الحلواني

(শামসুল আইম্মা হালওয়ানী রাহ. এমনটাই বলেছেন) এর অর্থ তিনি এক শহরের চাঁদ দেখাকে অন্য শহরের লোকদের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় বলেছেন। তাঁর বিস্তারিত ইবারতের উদ্ধৃতি 'আলমুহীতুল বুরহানী'র বরাতে সামনে আসছে। খানিয়ার উপরে উদ্ধৃত অংশটুকুর অর্থ কখনো এই নয় যে, শামসুল আইম্মা হালওয়ানীও 'উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়' বক্তব্যকে 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' বলেছেন। যিনি আরবী ইবারত সঠিকভাবে বোঝেন তিনি কখনো এমনটা বলবেন না। তথাপি যেন ত্বরাপ্রিয় কোনো পাঠকেরও বিভ্রান্তি না হয় এ জন্য বিষয়টি পরিষ্কার করলাম যে, এ না খানিয়ার এবারতের মর্ম, আর না বাস্তবের সাথে এর মিল আছে। যা বাস্তব তা 'আলমুহীতুল বুরহানী'র বরাতে স্বয়ং শামসুল আইম্মা হালওয়ানীর জবানীতে আসছে।

এ পর্যন্ত যে কথাগুলো আরজ করা হল তার সারসংক্ষেপ এই:

ক. 'উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়' বা পশ্চিমের চাঁদ দেখা পূর্বের অধিবাসীদের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয়' এ কথাগুলো ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহ. কারো থেকেই বর্ণিত নয়।

খ. এ কথাগুলো না জাহির রেওয়ায়েত-এর কিতাবসমূহে আছে, না নাদির রেওয়ায়েত-এর কিতাবসমূহে।

গ. নাদির রেওয়ায়েতে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো শহরের অধিবাসীরা যদি চাঁদ দেখে ত্রিশ রোযা রাখে তাহলে যে শহরের অধিবাসীরা উনত্রিশ রোযা রেখেছেন তারা একটি রোযা কাযা করবেন।

এ মাসআলা সাহেবাইন (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ) থেকে বর্ণিত। ইমাম আবু হানিফা থেকে নয়। এবং সাহেবাইন থেকেও 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'য় না 'নাদিরুর রিওয়ায়াহ'তে বর্ণিত। এ মাসআলাটিই ঐ ফকীহগণের বক্তব্যের ভিত্তি, যারা বলেছেন, হানাফী মাযহাবে উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়। অথচ হানাফী মুতাকাদ্দিমীন (পূর্বসূরী) ফকীহগণ এ মাসআলার এ অর্থ বুঝেছেন যে, এ বিধান কাছাকাছি অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে, দূরে দূরের শহর-নগরের ক্ষেত্রে নয়। দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য অবশ্যঅনুসরনীয় নয়। এ বিষয়টির আরো বিশদ আলোচনা আগামী শিরোনামগুলোর অধীনে আসছে ইনশাআল্লাহ।

হানাফী ইমামগণ থেকে বর্ণিত মাসআলা কী

আলহামদুলিল্লাহ, এটুকু তো প্রমাণিত হল যে‘উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়’ শীর্ষক মাসআলা ফিকহে হানাফীর ‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’ নয় এমনকি নাদির রেওয়ায়েতও নয়। এখন দেখার বিষয় এই যে, হানাফী ইমামদের থেকে বর্ণিত মাসআলা কী, যা থেকে পরবর্তীরা এই মাসআলা বের করেছেন যে‘উদয়স্থলের ভিন্নতার কোনো ইতিবার নেই।’ তো ঐ মাসআলা সেটিই যা খানিয়া, খুলাসা উভয় কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মাসআলাটি আমরা এখানে হাওয়ালাসহ উল্লেখ করছি।

মাসআলাটি হাকিম শহীদ রাহ. (৩৩৪ হি.)-এর ‘‘আলমুনতাকা’’ এর বরাতে ‘আলমুহীতুল বুরহানী’ তে বর্ণিত হয়েছে। ‘আলমুনতাকা’র বিষয়বস্তু হচ্ছে ‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’-এর বাইরের মাসাইল, যা তিনি নাওয়াদির ও আমালী থেকে জমা করেছেন। (কাশফুয যুনূন ২/১৮৫১-১৮৫২)

আর জাহিরুর রিওয়ায়া-এর মাসাইল তিনি সংকলন করেছেন ‘আলমুখতাসারুল কাফী’ তে।

আলমুহীতুল বুরহানীর ইবারত এই-

أهل بلدة إذا رأوا الهلالَ هل يلزم ذلك في حق أهل بلدة أخرى؟ اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا : لا يلزم ذلك به، وإنما المعتبر في حق كل بلدة رؤيتهم، وبنحوه ورد الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وفي المنتقى : بشر عن أبي يوسف، وإبراهيم عن محمد : إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوما للرؤية، وصام أهل بلدة تسعة وعشرين للرؤية فعليهم قضاء يوم.

وفي القدوري : إذا كان بين البلدتين تفاوت لا تختلف المطالع، لزم إحدى البلدتين حكم البلدة الأخرى، فأما إذا كان تفاوت تختلف المطالع فيه لم يلزم حكم إحدى البلدتين حكم البلدة الأخرى.

وذكر شمس الأئمة الحلواني : أن الصحيح من مذهب أصحابنا رحمهم الله : أن الخبر إذا استفاض وتحقق فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم أهل هذه البلدة.

অর্থ : কোনো শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখল। এ দেখা কি অন্য শহরের অধীবাসীদের জন্যও আবশ্যঅনুসরণীয়? এ বিষয়ে মাশাইখের ইখতিলাফ আছে। কেউ বলেন, অবশ্যঅনুসরণীয় নয়। প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের জন্য শুধু তাদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য। এ অর্থে আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. এর আছর বর্ণিত হয়েছে। আলমুনতাকায় আছে: বিশ্র আবু ইউসুফ রাহ. থেকে এবং ইবরাহীম মুহাম্মাদ রাহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন কোনো শহরের অধিবাসী চাঁদ দেখে ত্রিশ রোযা রাখে আর অন্য শহরের লোকেরা চাঁদ দেখে ২৯ রোযা রাখে তাহলে এদের একদিনের রোযা কাযা করা জরুরি।

কুদুরীতে আছে: যখন দুই শহরের মাঝে দূরত্ব এ পরিমাণ না হয় যদ্বারা তাদের উদয়স্থল আলাদা হয়ে যায় তখন এক শহরের বিধান অন্য শহরের জন্যও প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে দূরত্ব যদি এমন হয় যে, দুই শহরের উদয়স্থল আলাদা হয়ে যায় তাহলে একের বিধান অন্যের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

শামসুল আইম্মা হালওয়ানী রাহ. উল্লেখ করেছেন, আমাদের আসহাবের (ফকীহগণের) মাযহাবে সঠিক কথা এই যে, (এক শহরের সংবাদ) যদি 'মুস্তাফীয' (চারদিক থেকে ব্যাপকভাবে আসা) হয়ে যায় এবং অন্য শহরের অধিবাসীদের কাছে তা প্রমাণিত হয় তখন তাদের জন্য ঐ শহরের বিধান প্রযোজ্য হবে। (আলমুহীতুল বুরহানী খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:৩৪১-৩৪২, ইদারাতুল কুরআন করাচী কর্তৃক মুদ্রিত ১৪২৪ হিঐধঢ়ু

আলমুহীতুল বুরহানীর এ আলোচনার উপর চিন্তা করুন:

১. এতে 'জাহির রিওয়ায়াহ' বা 'নাদির রিওয়ায়াহ'-এর বরাতে لا عبرة لاختلاف المطالع বাক্য উল্লেখিত হয়নি।

২. এতে খানিয়া ও খুলাসায় বর্ণিত মাসআলা (২৯ রোযা আদায়কারীদের ১ রোযা কাযা করার বিধান) হাকিম শহীদ রাহ. এর (৩৩৪ হি.) আলমুনতাকা-এর বরাতে এসেছে। ''খিযানাতুল আকমালে''ও এ মাসআলা ''আলমুনতাকা'' এর বরাতে আছে (পৃষ্ঠা : ১১৬, মাখতূতা, জামেয়া উম্মুল কুরা)। ''আলমুনতাকা''র বিষয়বস্তু হচ্ছে নাদির রেওয়ায়েতের মাসাইল সংকলন করা। খোদ হাকীম শহীদ রাহ. ''আলমুনতাকা''র ভূমিকায় একথা স্পষ্টভাবে বলেছেন। ''কাশফুয যুনূনে'' (খ. ২ পৃ.১৮৫১-১৮৫২) হাজী-খলীফা তাঁর ইবারতও তুলে দিয়েছেন। ''আলমুনতাকা''য় মাসআলার সনদও উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ থেকে এ মাসআলার বর্ণনাকারী হচ্ছেন বিশ্র (অর্থাৎ বিশ্র ইবনুল ওয়ালিদ) আর ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. থেকে এর বর্ণনাকারী, ইবরাহীম (অর্থাৎ ইবরাহীম ইবনে রুস্তম)। দুজনই নাদির রেওয়ায়েতের রাবী, জাহির রেওয়ায়েতের নয়। জাহির রেওয়ায়েতের কিতাবসমূহের রাবী তো আবু হাফস কাবীর রাহ. (ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাজ) এবং আবু সুলায়মান মুসা ইবনে সুলায়মান আল জুযাযানী রহ.। (আলমাবসূত সারাখসী খ.৩০ পৃ ২৪৪)

অতপর এ মাসআলাটি বর্ণনা করেছেন আবুল লাইছ সমরকন্দী রহ. ‘‘উয়ূনুল মাসাইল’’ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা : ৩৮) ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর ‘‘আলআমালী’’ থেকে। আর এ তো জানা কথা যে,‘‘আলআমালী’’ নাদির রেওয়ায়েতেরই সূত্র। (রদ্দুল মুহতার খ. : ১, পৃ. : ৬৯)

এবং আল মুহীতুর রাযাভীতে (পৃ ১৯১-১৯২ আহসানুল উলূম করাচীর মাখতুতা) এ মাসআলা আছে ذکر هشام فی نوادره عن محمد رحمه الله শিরোণামে। অর্থাৎ হিশাম ইবনে উবায়দুল্লাহ রাযী একে নাওয়াদিরে (নাদির এর বহু বচন) ইমাম মুহাম্মাদ-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ মাসআলা নাদির রেওয়ায়েতের, জাহির রেওয়ায়েতের নয়।

৩. নাদির রেওয়ায়েতের এ মাসআলার সারকথা হচ্ছে, কোনো শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখে রোযা শুরু করেছে এবং ত্রিশ রোযা পুরা করার পর শাওয়ালের চাঁদ দেখেছে পক্ষান্তরে অন্য কোনো শহরের অধিবাসীরা রমযানের চাঁদ দেখে উনত্রিশ রোযা রেখেছে এরপর শাওয়ালের চাঁদ দেখেছে তাহলে এদেরকে একটি রোযা কাযা করতে হবে।

৪. এ মাসআলা সম্পর্কে চিন্তা করার বিষয় এই যে, এ বিধান কি এত ব্যাপক যে, পৃথিবীর যে কোনো শহরে চাঁদ দেখে ত্রিশ রোযা রাখা হলে পৃথিবীর অন্য যে কোনো শহরে যারা চাঁদ দেখে উনত্রিশ রোযা রেখেছে তাদেরকে এক রোযা কাযা করতে হবে? না এ বিধান শুধু কাছাকাছি শহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে নয়?

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. যাঁদের থেকে (নাদির রেওয়ায়েতে) এ মাসআলা বর্ণিত, তাঁদের ও তাঁদের শাগরিদ ইমামদের তরফ থেকে এ প্রশ্নের কোনো জবাব আমাদের জানা মতে নেই। পরের হানাফী ফকীহদের মাঝে এ বিষয়ে দুটি মত সৃষ্টি হয়েছে। একটি সাহেবে হেদায়া ও তাঁর পূর্বের অনেক ফকীহদের মত। তাঁরা এ বিধানকে শুধু কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেন। দ্বিতীয় মত ‘খুলাসা’ ও ‘খানিয়া’ লেখকদ্বয়ের। তাঁরা বাহ্যত একে আম ও ব্যাপক মনে করেন। তাঁদের মতে, এ বিধান দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আলমুহীতুল বুরহানীর লেখক ইমাম বুরহানুদ্দীন মাহমূদ (৬১৬ হি.) এর কাছে সম্ভবত প্রথম মতই অগ্রগণ্য। এ কারণে তিনি এ মাসআলা উল্লেখ করার পরই কুদুরী রহ. (৪২৮ হি.)-এর ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন, যা এ মতকে

সমর্থন করে। ‘পশ্চিমে চাঁদ দেখা গেলে পূবের লোকদের জন্যও তা প্রযোজ্য হওয়ার কথা, যা খুলাসা-লেখক উল্লেখ করেছেন সেটি বা তার কাছাকাছি কোনো কথা তিনি বর্ণনা করেন নি। যা দ্বারা দ্বিতীয় মতের সমর্থন হতে পারত।

৫. এ মাসআলার ইবারত (আরবী পাঠ) থেকে কারো এ ধারণা হতে পারত যে, অন্য শহরে চাঁদ দেখার যে কোনো প্রকার সংবাদ এলেই তা অবশ্যঅনুসরণীয়। অথচ বাস্তবতা এমন নয়। একারণে এ ধারণার সংশোধনের জন্য তিনি শামসুল আইম্মা হালওয়ানীর বক্তব্য বর্ণনা করেছেন, যাতে এ কথার উল্লেখ আছে যে, শুধু সংবাদ পৌঁছা যথেষ্ট নয়। তা মুস্তাফীয (চারদিক থেকে ব্যাপকভাবে আসা) ও মুতাহাক্কিক (প্রমাণিত) হওয়া জরুরী। আর তখনই সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ এর ভিত্তিতে ফায়সালা করতে পারবেন।

নাদির রেওয়ায়েতের এ মাসআলার ব্যাখ্যা

হানাফী ফকীহগণের সিদ্ধান্ত

যেমনটা ইতিপূর্বে বলেছি অনেক ফকীহ নাদির রেওয়ায়েতের এ মাসআলার অর্থ এই বুঝেছেন যে, এই বিধান কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে। এখানে তাঁদের ইবারত নকল করা হচ্ছে:

1. ইমাম আবুল হুসাইন আলকুদুরী রাহ. (৪২৮ হি.)

তিনি শরহু মুখতাসারিল কারখীতে নাদির রেওয়ায়েতের মাসআলাটি উল্লেখ করার পর বলেন-

وهذا إذا كان بين البلدتين تفاوت لا تختلف فيه مطلع الهلال، فأما إذا بعد أهل البلدين من الآخر بعدا كثيرا لم يلزم أهل أحد البلدين حكم الآخر، لأن مطالع البلاد تختلف.

যার সারকথা হল, দুই শহরের মাঝে দূরত্ব বেশি হলে অপর শহরের অধিবাসীদের জন্য এক রোযা কাযা করার বিধান প্রযোজ্য নয়।

(শরহু মুখতাসারিল কারখী, সওম অধ্যায়ে, বাবুল ইতিকাফের দুই পৃষ্ঠা আগে। মাখতূতা, জামেয়া উম্মুল কুরা-এটির কপিও সংগ্রহ করেছেন শায়েখ ত্বহা হুসাইন দানিশ, জাযাহুল্লাহ খাইরান।)

২. ইমাম হুসামুদ্দীন শহীদ রাহ. (৫৩৬ হি.)

হিদায়া গ্রন্থকারের বিশেষ উস্তাদগণের অন্যতম। ৫৩৬ হিজরীতে তার শাহাদাতের ঘটনা ঘটে। তিনি ‘‘আলফাতাওয়াল কুবরা’’ নামে ফিকহ ও ফতোয়ার একটি সংকলন প্রস্তুত করেছেন। যার বিন্যাসের কাজ করেছেন ইমাম নাজমুদ্দীন ইউসুফ ইবনে আহমদ আলখাসী। এর একটি মাখতূতা রিয়াসত রামপুরের মাকতাবায়ে রেযা’তে সংরক্ষিত আছে। এর সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাগুলোর ফটোকপি দেওবন্দের মাওলানা মোশতাক আহমাদ আমার জন্য পাঠিয়েছেন।

এর ‘আলফাতাওয়াল কুবরা’র (পৃ. ১৬) ‘‘কিতাবুস সাওমে’র ‘‘আলফাসলুল খামিস’’-এ লেখেন

ولو صام أهل بلدة الرؤية ثلثين يوما وبلدة أخرى تسعة وعشرين يوما فعلم من صام تسعة وعشرين يوما فعليهم قضاء يوم، لأن الذين صاموا ثلثين يوما رأوا هلال رمضان قبلهم بليلة والعمل بقول من رأى لا بقول من لم ير، هذا إذا كان بين البلدتين تقارب بحيث لا تختلف المطالع، وإن كانت تختلف لا يلزم أهل أحد من البلدتين حكم الآخر.

অর্থ : কোনো শহরের অধিবাসীরা যদি চাঁদ দেখে ত্রিশ দিন রোযা রাখে আর অন্য শহরের অধিবাসীরা উনত্রিশ দিন রোযা রাখে অতপর উনত্রিশ রোযা আদায়কারীগণ তা জানতে পারে তাহলে তাদেরকে একটি রোযা কাযা করতে হবে। কারণ যারা ত্রিশ রোযা রেখেছে তারা একরাত আগে চাঁদ দেখেছে। আর আমল তো তাদের কথা অনুসারেই হওয়া চাই যারা (চাঁদ) দেখেছে। তাদের কথা অনুসারে নয় যারা দেখেনি।

এ (বিধান) ঐ ক্ষেত্রে যখন দুই শহর কাছাকাছি হয়, এদের উদয়স্থল আলাদা না হয়। উদয়স্থল আলাদা হলে কোনো শহরের বিধান অন্য শহরের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় হবে না। (আলফাতাওয়াল কুবরা পৃ. ১৬, মাখতুতা মাকতাবায়ে রেযা, রামপুর, হিন্দুস্তান)

3. ইমাম আব্দুর রশীদ আলওয়ালওয়ালিজী (৪৬৭ হি.-৫৪০ হি.-এর পর)

তিনি ‘আলফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালিজিয়্যাহ’ তে আলোচিত মাসআলা লিখে সাথে সাথে তাম্বীহ করেছেন যে,

وهذا إذا كان بين البلدتين تفاوت بحيث لا تختلف المطالع، فإن كانت تختلف لا يلزم أحد البلدين حكم الآخر.

অর্থাৎ, এ বিধান ঐ সময় প্রযোজ্য যখন দুই শহর কাছাকাছি হয় যার কারণে এদের উদয়স্থল আলাদা হয় না। পক্ষান্তরে উদয়স্থল আলাদা হলে এক শহরের হুকুম অন্য শহরের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় হবে না। (আলফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালিজিয়্যাহ খ. ১ পৃ.২৩৬, মুদ্রন, দারুল ঈমান, সাহারানপুর, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুতের সংস্করণের ফটো সংস্করণ)

৪. ইমাম রযিউদ্দীন আসসারাখসী (৫৪৪ হি.)

তাঁর নাম মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ, উপাধী রযিউদ্দীন, নিসবত, সারাখসী ইনি শামসুল আইম্মা সারাখসী মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ‘মাবসূত’-লেখক (৪৮৩ হি.)-এর কিছু পরের। ইবনে আবেদীন শামী রাহ. ‘রদ্দুল মুহতার’ (খ.১, পৃ. : ৬৯)-এ তাঁর কিতাব ‘আলমুহিত’ (যাকে আলমুহীতুর রাযাভী ও ‘মুহীতুস সারাখসী’ বলা হয়)-এর প্রশংসা করেছেন যে, তিনি জাহির রিওয়ায়াহ, নাদির রিওয়ায়াহ ও ফাতাওয়া মাসাইলকে আলাদা আলাদা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম রযীউদ্দীন ‘আলমুহীত’ গ্রন্থে ‘নাওয়াদিরে হিশাম’-এর বরাতে উপরোক্ত মাসআলা বর্ণনা করার পর লেখেন-

وهذا إذا كان (بينهما تقارب) بحيث لا يختلف فيه مطلع الهلال، لأن الرؤية لا تفاوت ولا يختلف، فيلزم أحدهما حكم الآخر، وإن كان بينهما مسافة مزيدة بحيث يختلف فيها المطالع لم يلزم أحدهما حكم الآخر.

অর্থাৎ এ বিধান ঐ সময় প্রযোজ্য, যখন দুই শহর কাছাকাছি হয়, যদ্বারা চাঁদের উদয়স্থল অভিন্ন থাকে। কারণ এ অবস্থায় তো চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে

(বাস্তবের বিচারে) কোনো বিভিন্নতা নেই। তাই এক শহরের বিধান অপর শহরের জন্য প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি দুই শহরের মাঝে দূরত্ব বেশি হয় যদ্বারা এদের উদয়স্থল আলাদা হয়ে যায়, তাহলে এক শহরের উপর অন্য শহরের বিধান প্রযোজ্য হবে না। (মুহীতুস সারাখসী পৃ ১৯১-১৯২, মাখতূতা, আহসানুল উলূম, গুলশান ইকবাল, করাচী)

৫. কাযিল কুযাত ইমাম জামালুদ্দীন আলমুতাহহির ইবনে হুসাইন আলইয়াযদী

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রশীদ রুকনুদ্দীন আলকিরমানী (৫৬৫ হি.)-এর খাস উস্তাজ। 'জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া' - গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ের (কিতাবের) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে (বাব) তিনি শুধু তাঁর ফতোয়াগুলো সংকলন করেছেন। ভূমিকায় তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি ইলম ও ফিকহের ক্ষেত্রে এ যামানার (হিজরী ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধের) ইমাম।

فإنه إمام هذا العصر في العلم والفقه واستنباط المعاني وحل المشكلات وكشف المعضلات ...

'জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া'র মাখতূতা শাবাকায় (ইন্টারনেটে) আছে। জামেয়াতুল মালিক সাউদ রিয়াদের মাখতূতা শাবাকায় পড়া যায়। এতে ইমাম জামালুদ্দীন আলইয়াযদী থেকে যখন উপরোক্ত মাসআলা বর্ণনা করেছেন তখন সাথে সাথে পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, এ বিধান কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে। আরবী পাঠ এই

لو صام أهل بلد تسعة وعشرين وأهل بلدة ثلثين إن كان يختلف المطالع لا يلزم أحدهما حكم الآخر، وإن كان لا يختلف المطالع يلزم.

(জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া : ৩২-৩৩, মাখতূতা, জামেয়া মালিক সাউদ রিয়ায)

৬. ইমাম রুকনুদ্দীন আলকিরমানী রাহ. (৫৬৫ হি.)

তিনি 'জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া'র বিভন্ন জায়গায় এ মতই উল্লেখ করেছেন। এবং এর বিপরীতে কোনো কথা বর্ণনা করেননি।

৭. ইমাম বুরহানুদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর আল মারগীনানী (৫৯৩ হি.) হিদায়া গ্রন্থকার।

তাঁর কিতাব 'আততাজনীছু ওয়াল মাযীদ' অনেক দিন আগেই ছাপা হয়েছে। এতে তিনি এ মাসআলা উল্লেখ করে ঐ নোট দিয়েছেন যে, এ বিধান কাছাকাছি অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে। দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক শহরের হুকুম অন্য শহরের জন্য অবশ্য-প্রযোজ্য নয়। আরবী পাঠ এই

وهذا إذا كان بين البلدين تقارب، بحيث لا تختلف المطالع، فإن كان يختلف لا يلزم أحد البلدين حكم الآخر.

(আততাজনীছু ওয়াল মাযীদ খ. ২ পৃ. ৪২৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

সারকথা এই যে, নাদির রেওয়ায়েতের এ মাসআলার ব্যাখ্যা তৃতীয় শতক থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত বড় বড় ফকীহগণ এ-ই করেছেন যে, এ বিধান কাছাকাছি অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দূর-দরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের বিধান অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্য পালনীয় নয়।

এখানে তো শুধু আকাবিরের ব্যাখ্যা ও বক্তব্য উদ্ধৃত করা হল, যারা নাদির রেওয়ায়েতের এ মাসআলার ব্যাখ্যা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। আর যাঁরা এ মাসআলা উল্লেখ করা ছাড়া মূল বিধানটি বলেছেন যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের জন্য অন্য অঞ্চলের চাঁদ দেখা অবশ্য প্রযোজ্য নয়, তাদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। তাঁদের উদ্ধৃতি সামনে আসছে। ইনশাআল্লাহ। এখন শুধু এইটুকু নিবেদন যে, নাদির রেওয়ায়েতের যে মাসআলা খুলাসা খানিয়ার লেখক ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য মনে করেছেন, তাঁদের আগের ও তাদের সমসাময়িক বড় বড় ফকীহ এ বিধানকে শুধু কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেন।

এক আবু বকর জাসসাস আররাযী (৩৭০হি.) যাঁর কিতাব 'আহকামুল কুরআন' (খ. ১ পৃ. ২২০-২২২) এর বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি এ বিধানকে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য মনে করেন। দ্বিতীয় ব্যাক্তিত্ব শামসুল আইম্মাহ হালওয়ানী (৪৪৮ হি.), তাঁর বরাতে খুলাসা গ্রন্থকার যে ইবারত উদ্ধৃত করেছেন বর্ণনায় কোনো তাসামুহ না হয়ে থাকলে তিনিও সম্ভবত এ বিধানকে আম ও ব্যাপক মনে করেন। এ দুজন ছাড়া ষষ্ঠ হিজরী শতক পর্যন্ত কোনো বড় ফকীহ সম্পর্কে আমার জানা নেই যে, তিনি এ বিধানকে আম ও ব্যাপক মনে করেছেন।

এ পর্যন্ত যা কিছু নিবেদন করা হল তার সারসংক্ষেপ এই -

১. لاعبرة لاختلاف المطالع (উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়) এ কথার উল্লেখ হানাফী মাযহাবের জাহির রিওয়ায়াহ ও নাদির রেওয়ায়াহ কোথাও নেই। এবং তা মাযহাবের প্রথম তিন ইমামের কারো থেকেই বর্ণিত নয়।

২. নাদির রিওয়ায়েতের ঐ মাসআলাটি শুধু সাহেবাইন (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহ.) থেকে বর্ণিত।

৩. এ মাসআলাকে হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ বড় বড় ফকীহ শুধু কাছাকাছি অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেন। দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে তারা এ মাসআলা প্রযোজ্য মনে করেন না।

৪. لاعبرة لاختلاف المطالع (চাঁদের উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়) এ বাক্য আমাদের জানামতে সর্বপ্রথম খুলাসা ও খানিয়ার লেখকদ্বয় ব্যবহার করেছেন।

'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা

আলহামদুলিল্লাহ এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। তবে ইলমুল ফিকহের প্রাথমিক স্তরের তালিবে ইলম ভাইদের মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আমরা শুনেছি'মুতূন' শিরোনামে ফিকহের যে মুখতাসার কিতাবসমূহ আছে তা 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর মাসাইলের জন্য সংকলিত। এ শ্রেণির একটি গুরুত্বপূর্ণ মতন 'কানযুদ দাকাইক', যা দরসে নেযামীর এক বিশেষ কিতাব। তাতে আছে-

لا عبرة لاختلاف المطالع

(উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়।)

এ থেকে তো বোঝা যায়, এটি 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'র মাসআলা। এ তালিবানে ইলমের খিদমতে আরজ এই যে, প্রথমত, এ কথা সঠিক নয় যে'মুতূন'শ্রেণির গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত সকল মাসআলা 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর। এ সকল কিতাবে অনেক মাসআলা 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর বাইরেরও আছে। দ্বিতীয় কথা এই যে'মুতূন'-এর প্রাচীন গ্রন্থসমূহ, যা সালাফের মাঝে 'মুতালাক্কা বিল কবূল' (ব্যাপকভাবে সমাদৃত) ছিল তাতে এ মাসআলা নেই। মুখতাসারুত তহাবী, মুখতাসারুল হাকিমিশ শহীদ, মুখতাসারুল কারখী, মুখতাসারুল কুদূরী, তুহফাতুল ফুকাহা, বিদায়াতুল মুবতাদী-এ সব তো মুতূন-শ্রেণির কিতাব। এসব কিতাবে আমাদের জানা মতে এ মাসআলা নেই।

মুতাআখখিরীনের নিকটে প্রসিদ্ধ 'মুতূন'-গ্রন্থাবলির অন্যতম হচ্ছে 'আলবিকায়া'। এতে এ মাসআলা নেই। মাওসিলীর 'আলমুখতার' কিতাবে যদিওবা খানিয়ার অনুসরণে এ মাসআলা লেখা হয়েছে, কিন্তু মাওসিলী নিজেই 'আলমুখতার'-এর ভাষ্যগ্রন্থে বিপরীত সিদ্ধান্তকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় নয়।

এক 'মতন'-গ্রন্থ সাআতীর 'মাজমাউল বাহরাইন ওয়া মুলতাকান নাইয়িরাইন'। এতে তিনি 'মুখতাসারুল কুদূরী' ও 'মানযূমাতুন নাসাফী'র মাসায়েল একত্র করেছেন। এতে তিনি উপরোক্ত মাসআলা এনেছেন د (দাল) বর্ণের

নির্দেশিকার সাথে। د (দাল) বর্ণের অর্থ, এটি 'যাইদ' বা অতিরিক্ত মাসআলা। অর্থাৎ যে দুই কিতাব থেকে তিনি মাসআলা সংকলন করেছেন তাতে এ মাসআলা নেই।

সারকথা এই যে, অধিকাংশ মতন, বিশেষত মুতাকাদ্দিমীনের মতনসমূহে এ মাসআলার (উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়) উল্লেখ নেই। 'মাজমাউল বাহরাইন'ও'কানয'ও'মুলতাকাল আবহুর'সহ দু' চার মতনে যদিওবা এ মাসআলা আছে, কিন্তু এগুলোর লেখকগণ সকলেই খুলাসা-খানিয়ার পরের এবং এগুলোর অধিকাংশ গবেষক ভাষ্যকার অন্য সিদ্ধান্ত (দূর-দূরান্তের শহর-নগরে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য লাযিম নয়)-কে প্রাধান্য দিয়েছেন।

'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' হওয়াই কি অগ্রগণ্যতার একমাত্র কারণ?

একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, কোনো মাসআলা জাহির রিওয়ায়া হওয়াই অগ্রগণ্যতার একমাত্র কারণ নয়। এটা খুবই সম্ভব যে'আসহাবুত তারজীহ' (ইখতিলাফী মাসাআলাসমূহে রাজিহ-মারজূহ নির্ধারণকারী ফকীহবৃন্দ) দলীলের শক্তি বা অন্য কোনো বিবেচনায় অন্য কওলকে (বক্তব্য) তারজীহ দিবেন। ফলে সেক্ষেত্রে ঐ অগ্রগণ্য কওল অনুসারেই আমল হবে'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' অনুসারে নয়। যেমনটা রাসমুল মুফতী ও উসূলুল ইফতার কিতাবসমূহে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। আর ইবরাহীম হালাবীর বাক্যে এ মূলনীতি তো খুই প্রসিদ্ধ-

ولا يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية

সুতরাং 'উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়া' যদি বাস্তবে 'জাহিরুর রিওয়ায়া'ও হত এরপরও যেহেতু মাযহাবের বড় বড় ফকীহগণের কেউ হয়তো তা উল্লেখই করেননি, শুধু বিপরীত কওলটিই উল্লেখ করেছেন কিংবা উল্লেখ করলেও বিপরীত কওলটিকে 'সহীহ' বা 'আশবাহ' (অর্থাৎ দলীলের বিচারে অধিক উপযুক্ত এবং শরীয়তের নীতিমালার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ) বলেছেন। সুতরাং এ অনুসারে ফতোয়া দেওয়া ও এর উপর আমল করায় আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। কারণ বিষয়টি তো ইজতিহাদী ও ইখতিলাফী।

তাহলে বাস্তবতা যখন এই যে, একে 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' বলাই ভুল, তখন এর বিপরীত কওল গ্রহণ করায় তো আপত্তির প্রশ্নই আসে না।

তলাবায়ে কেরাম এ বিষয়টিও লক্ষ্য করুন যে, যখন এই প্রসিদ্ধ কওলকে 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' বলা 'তাসামুহ' (ভ্রম) তখন পরের যে লেখকগণ এই কওলকে শুধু এ কারণে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, তা 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'

তাদের এই ‘তারজীহ’ এ কওলের শক্তি বৃদ্ধি করে না। ‘আলবাহরুর রাইক’ ও ‘মাজমাউল আনহুর’সহ বিভিন্ন ফিকহের কিতাবে এ কওলকে এ কারণেই তারজীহ দেওয়া হয়েছে যে, এটি ‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’ সুতরাং এ তারজীহ বিশেষ কোনো শক্তি রাখে না।

সামনে অগ্রসর হওয়ার আগে দুটি জরুরি নোট :

এক. অধম যা লিখেছি যে, আলোচিত বিষয়ে মুতাআখখিরীনের নিকটে যে সিদ্ধান্ত প্রসিদ্ধ, তা ‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’ নয়, এটি আমার সাধ্য অনুযায়ী তাহকীক-অনুসন্ধানের পর লিখেছি। এরপরও যদি এক্ষেত্রে আমার কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে তলাবায়ে কেরাম ও ফিকহ-ফতোয়ার সাথে মশগুল উলামায়ে কেরামের কাছে বিনীত নিবেদন, তাঁরা অনুগ্রহ করে আমাকে তাম্বীহ করবেন, আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।*

দুই. প্রসিদ্ধ কওলটি সম্পর্কে উপরের আলোচনায় শুধু এটুকু বলা হয়েছে যে, একে হানাফী মাযহাবের ‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’ সাব্যস্ত করা ভুল। এর অর্থ এই নয় যে, হানাফী মাযহাবের সাথে এ কওলের কোনো সম্পর্কই নেই। কারণ একাধিক হানাফী ফকীহর কাছে এ কওল রাজিহ-অগ্রগণ্য এবং তাঁরা একে ‘মুফতা বিহী কওল’ (যে কওল অনুসারে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে বা ফতোয়া দেওয়া উচিত) সাব্যস্ত করেছেন। এরপর অন্যান্য ফিকহী মাযহাবের অনেক ফকীহরও মাসলাক এটিই। এবং এ কওলেরও শরয়ী দলীল আছে। এ কারণে কোনো দেশের দায়িত্বশীলগণ যদি এই কওল অনুযায়ী ফয়সালা করেন তাহলে এর উপরও আপত্তি করা ঠিক নয়। কারণ যেমনটা আগে বলা হয়েছে যে, এ মাসআলা ইজতিহাদী ও ইখতিলাফী।

আপত্তি তো ঐ সকল লোকদের উপর, যারা এই প্রসিদ্ধ কওলের আড়ালে (যাকে ভুলবশত ‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’ বলে দেওয়া হয়েছে) মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশের ব্যাপারে কটূক্তি করে, যারা নিজেদের আলিম-উলামা ও দায়িত্বশীলদের ফয়সালা অনুসারে নিজ নিজ এলাকার চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করেন। অথচ তাদের এ আমল শরয়ী দলিলভিত্তিক এবং ঐ তরীকার মুতাবিক যা সব সময় মুতাওয়ারাছ চলে আসছে। আর যা হানাফী মাযহাবের অতি নির্ভরযোগ্য কওল, যে অনুযায়ী বহু আগে থেকেই বড় বড় ফকীহ ফতোয়া দিয়ে আসছেন। যদিও কোনো কোনো কিতাবের বর্ণনাভঙ্গি থেকে কিছু মানুষের বিভ্রান্তি হয়েছে যে, এ কওল হানাফী ফকীহগণের মাঝে শুধু যায়লায়ীর, বা কাসানী ও যায়লায়ীর কওল (সিদ্ধান্ত)!

এখন আমরা দেখব, এ কি বাস্তবেই শুধু ঐ দুই মনীষীর সিদ্ধান্ত, না তাঁরা ছাড়াও অনেক বড় বড় হানাফী ফকীহের সিদ্ধান্ত। বিশেষভাবে মুতাকাদ্দিমীনের (পূর্ববর্তীদের) কাছে তো এ কওলই বেশি প্রসিদ্ধ ছিল। সংক্ষিপ্ত করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আলোচনা লম্বা হতে চলেছে, আমি পাঠকবৃন্দের কাছে ধৈর্য ধারণের অনুরোধ করছি।

এখন সংক্ষেপে ঐ বড় বড় ফকীহর কথা শুনুন, যাঁদের সিদ্ধান্ত এ-ই ছিল যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের কোনো এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় নয়।

১. ইমাম আবু আবদিল্লাহ আলফকীহুল জুরজানী (৩৯৮ হি.)

ইমাম কুদূরী রাহ.-এর উস্তায ও ইমাম আবু বকর আলজাসসাস রাহ.-এর শাগরিদ। আলজামিউল কাবীর-এর ভাষ্যকার। 'ইখতিলাফুল মাতালি' (উদয়স্থলের ভিন্নতার) ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত এ-ই ছিল যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় নয়।

ইমাম আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ. ''আলআরফুশ শাযী''-তে (১/১৪৯ জামে তিরমিযীর হাশিয়ায়) আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানূরী রাহ. ''মাআরিফুস সুনানে'' (৫/৩৩৭) ও আরবের মশহূর ও জনপ্রিয় আলিম আল্লামা আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন হুমাইদ ''তিবয়ানুল আদিল্লাহ ফী ইছবাতিল আহিল্লা'' কিতাবে (পৃষ্ঠা : ১৫) আলজুরজানীর** এ মাসলাকই (সিদ্ধান্তই) উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, এ বিষয়ে যায়লায়ীর মাসলাক যা জুরজানীর মাসলাকও তা-ই।

২. আবুল হুসাইন আলকুদূরী (৪২৮ হি.)

গত সংখ্যায় তাঁর কিতাব 'শরহু মুখতাসারিল কারখী' এবং 'আলমুহীতুল বুরহানী'র বরাতে তাঁর মাসলাক লেখা হয়েছে। তিনি পরিষ্কার বলেছেন, দূরবর্তী অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য 'লাযিম' বা অবশ্য-অনুসরণীয় নয়।

৩. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আবু বকর আলহাসীরী (৫০০ হি.)

ইলমুল ফিকহে বিশেষভাবে শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহ.-এর এবং ইলমে হাদীসে অনেক মুহাদ্দিসের শাগরিদ। বুখারা নগরে ৫০০ হিজরীতে ইন্তিকাল। 'আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যা'হ (৩/৮) ও ''আলফাওয়াইদুল বাহিয়্যা''য় তাঁর 'তরজমা' (পরিচিতি মূলক আলোচনা) আছে। ফিকহ-ফতোয়া বিষয়ে তাঁর কিতাব ''আলহাভী'' খুব নির্ভরযোগ্য ও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বরাতগ্রন্থ। এবং 'হাভিয যাহিদী' ও 'আলহাভিল কুদসী'র আগের। (কাশফুয যুনূন)

এ কিতাবের একাধিক মাখতূতা মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন কুতুবখানায় সংরক্ষিত আছে। এ মুহূর্তে আমি তাঁর বক্তব্য হিদায়া-গ্রন্থকার ইমাম বুরহানুদ্দীন আলমারগীনানী রাহ.-এর কিতাব 'আততাজনীস' থেকে নকল করছি। ছাহিবে হেদায়া লেখেন-

وفي الحاوي : أهل بلدة رأوا الهلال يوم الثلثاء، وأهل بلدة أخرى يوم الأربعاء يحكم لكل بلدة بما رأوا، ولا ينظر إلى أهل بلدة أخرى ... .

অর্থ : 'আলহাভী'তে আছে, যদি কোনো শহরবাসী মঙ্গলবার চাঁদ দেখে আর অন্য শহরের অধিবাসীগণ বুধবার তাহলে প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য তাদের নিজেদের চাঁদ দেখা অনুসারে ফয়সালা করা হবে। অন্য শহরের দিকে দেখা হবে না। (আততাজনীস ওয়াল মাযীদ ২/৪২৩)

ইমাম আবু বকর হাসীরী রাহ.-এর বক্তব্য বর্ণনা করে হেদায়া-গ্রন্থকার যে মন্তব্য লিখেছেন তার সারমর্ম হচ্ছে, এ বিধান দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে। কাছাকাছি অঞ্চলসমূহে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকায় শরয়ী পদ্ধতিতে প্রমাণিত হলে দায়িত্বশীলগণ সে অনুযায়ী ফয়সালা করবেন।

৪. হুসামুদ্দীন আসসদরুশ শহীদ (৫৩৬ হি.)

''আলমুহীতুল বুরহানী''র লেখকের সম্মানিত চাচা, হেদায়া-লেখক ও আল্লামা কাযীখান রাহ.-এর খাস উস্তাদ, ফিকহ-ফতোয়ার প্রসিদ্ধ ইমাম। তাঁর বক্তব্য তাঁর কিতাব ''আলফাতাওয়াল কুবরা'র 'মাখতূতা' (হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি) থেকে গত সংখ্যায় পেশ করা হয়েছে।

৫. ফকীহ আবদুর রশীদ আলওয়ালওয়ালিজী (মৃত্যু ৫৪০ হি.-এর পরে)

তাঁর কিতাব 'আলফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালিজিয়্যাহ' থেকে উদ্ধৃত বক্তব্য আপনারা গত সংখ্যায় পাঠ করেছেন।

৬. রুকনুদ্দীন আবুল ফযল আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ আলকিরমানী (৫৪৩ হি.)

গত সংখ্যায় 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া'র বর্ণনায় পাঠক এ বাক্য পাঠ করেছেন-

وفي التجريد : يعتبر اختلاف المطالع

অর্থাৎ 'তাজরীদ'-গ্রন্থে আছে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য। (খুলাসাতুল ফাতাওয়া) এর অর্থ, তাজরীদ-লেখকের কাছে দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য লাযিম নয়।

ফিকহে হানাফীতে যদিও 'তাজরীদ' নামে একাধিক কিতাব আছে, তবে বেশি প্রসিদ্ধ দুটি কিতাব : এক. ইমাম আবুল হুসাইন আলকুদূরী রাহ.-এর ''আততাজরীদ'', যা কয়েক বছর আগে ১২ খন্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। যেহেতু এ ''তাজরীদ''ই বেশি প্রসিদ্ধ এবং এর লেখক ইমাম কুদূরী রাহ.ও খুলাসা-লেখকের আগের আর বাস্তবেও ইমাম কুদূরীর মাসলাকও সেটিই এ কারণে কারো ধারণা হতে পারে যে, উপরের বরাতে ইমাম কুদূরীর তাজরীদই উদ্দেশ্য। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। প্রথমত এ কারণে যে, কুদূরী রাহ.-এর ''তাজরীদে''র মুদ্রিত নুসখায় আমাদের জানামতে এ মাসআলা নেই, দ্বিতীয়ত ''খুলাসায়'' এমন অনেক মাসআলায় ''তাজরীদে''র বরাত দেয়া হয়েছে ও ইবারত আনা হয়েছে যা নিঃসন্দেহে কুদূরীর তাজরীদে নেই। তৃতীয়ত কুদূরীর এ কিতাবের বিষয়বস্ত হচ্ছে, ঐ সকল মাসআলার দালীলিক ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ, যেগুলোতে ইমাম আবু হানীফা রাহ. ও ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর মাঝে ইখতিলাফ হয়েছে। অথচ 'উদয়স্থলের ভিন্নতা' শীর্ষক মাসআলা (অন্তত ইমাম কুদূরীর মতে) এ শ্রেণির নয়। ইমাম কুদূরী রাহ. এ মাসআলার যে সমাধান ''শরহু মুখতাসারিল কারখী'' তে উল্লেখ করেছেন ফিকহে শাফেয়ীর সমাধানও তাই। এ কারণে তাঁর নিকটে এ মাসআলা তাঁর ''তাজরীদ'' গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সাথে সরাসরি যুক্ত নয়।

''তাজরীদ'' নামে দ্বিতীয় মশহূর কিতাব ইমাম রুকনুদ্দীন আবুল ফযল আলকিরমানী রাহ. (৪৫৭-৫৪৩ হি.)-এর, যা ফিকহে হানাফীর বুনিয়াদী কিতাবসমূহের অন্যতম। 'তাজরীদুল কুদূরী' থেকে আলাদা করার জন্য কখনো কখনো একে 'তাজরীদুর রুকনী' নামেও উল্লেখ করা হয়।

আফসোস, এ অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, যা এখনো মুদ্রিত হয়নি, তবে আনন্দের কথা এই যে, মক্কা মুকাররমায় উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটির 'কুল্লিয়াতুশ শারীয়া'য় (ফিকহ বিভাগ) এ কিতাবের তাহকীকের (পান্ডুলিপি সম্পাদনার) কাজ শুরু হয়েছে এবং ১৪৩২-১৪৩৩ হিজরীতে আবদুল্লাহ বিন সুলায়মান বিন ওয়ায়িল আত-তুয়াইজিরী কিতাবের শুরু থেকে 'বাবুয যিহার' পর্যন্ত তাহকীক করে ফিকহ বিষয়ে ডক্টরেট এর অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করেছেন।

''খুলাসাতুল ফাতাওয়া''য় যে তাজরীদের বরাত বারবার আসে তা এই ''আততাজরীদুর রুকনী''।*** এ কিতাবের উপর জামেয়া উম্মুল কুরায় যে কাজ হয়েছে সে সম্পর্কে আমাকে অবগত করেছেন আমাদের ফিকহ-বিভাগের চতুর্থ বর্ষে অধ্যয়নরত তালিবে ইলম মৌলভী ফয়যুল্লাহ। এরপর আমার অনুরোধে শায়খ ত্বহা হোসাইন কিতাবের

সম্পাদিত নুসখা থেকে সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাগুলো আমার জন্য পাঠিয়েছেন। এতে এ মাসআলার উপর যে আলোচনা এসেছে তা নিম্নরূপ :

ولو صام أهل مصر ثلاثين يوما للرؤية، وصام أهل بلد تسعة وعشرين يوما للرؤية فعلى هؤلاء قضاء يوم واحد، وهذا إذا كان بين البلدين تقارب لا تختلف المطالع، فإن كان يختلف لم يلزم أحد البلدين حكم الآخر.

(আততাজরীদ, আবুল ফজল আলকিরমানী ১/৩৪০-৩৪১; এতে তিনি ঐ কথাই বলেছেন, যা ইমাম কুদূরীসহ অন্যান্য ফকীহগণ বলেছেন।)

৭. রযীউদ্দীন আসসারাখসী (৫৪৪ হি.)

গত সংখ্যায় ''মুহীতুস সারাখসী'' (মাখতূত) থেকে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে।

৮. মাজদুশ শরীয়া সুলায়মান ইবনুল হাসান আলকিরমানী (কাযি মুহাম্মাদ)

আপন যুগে কাযিল কুযাত ছিলেন এবং ফিকহ-ফতোয়ার ক্ষেত্রে সমাধানদাতা মনীষী ছিলেন। ইমাম রুকনুদ্দীন আলকিরমানী রাহ. (৫৬৫ হি.) ''জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া''য় প্রত্যেক বিষয়ের অধীনে 'আলবাবুল খামিস' শিরোনামে তাঁর ফতোয়াসমূহ সংকলন করেছেন। ''জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া''র 'কিতাবুস সওমে'র 'আলবাবুল খামিসে' আছে-

أهل بلد عيَّدوا يوم الإثنين، وأهل بلد آخر عيَّدوا يوم الثلثاء لا يجب عليهم قضاء يوم.

أهل بلد رأوا هلال رمضان وأعلموا أهل البلد الآخر بذلك، وهم لم يروا، فهذا على وجهين : إن كان المطلع في حقهما متحداً يلزم كل واحد منهما حكم الآخر، فإذا أعلمهم عدلان منهم يلزمهم حكم الصوم والفطر، وإن كان بين البلدين مسافة يختلف المطالع في حقهم فلا يلزم واحدا حكم الآخر.

অর্থ : কোনো শহরের অধিবাসীগণ সোমবার ঈদ করেছে, অন্য শহরের অধিবাসীগণ মঙ্গলবার তাহলে প্রথমোক্তদের উপর একদিনের কাযা জরুরি নয়।

কোনো শহরের অধিবাসীগণ রমযানের চাঁদ দেখেছে এবং অন্য কোনো শহরের অধিবাসীদেরকে এ সংবাদ পৌঁছাল, যারা নিজেরা চাঁদ দেখেনি, এক্ষেত্রে দুই অবস্থা : যদি উভয় শহরের উদয়স্থল অভিন্ন হয় তাহলে একের হুকুম অন্যের জন্য লাযিম হবে। সুতরাং তাদের দুজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি তাদেরকে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে থাকলে তাদের উপর রোযা-ঈদের বিধান আরোপিত হবে।

পক্ষান্তরে দুই শহরের মাঝে যদি এ পরিমাণ দূরত্ব হয় যে, উদয়স্থল আলাদা হয়ে যায় তাহলে এক শহরের উপর অন্য শহরের বিধান 'লাযিম' হবে না।

(জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া : ৩৬, মাখতূতা, জামিয়াতুল মালিক সাউদ, রিয়ায, সৌদী আরব)

৯. জামালুদ্দীন আলমুতাহহির ইবনে হুসাইন আলইয়াযদী

তাঁর বক্তব্য 'জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া'র বরাতে বিগত সংখ্যায় পাঠ করেছেন।

১০. রুকনুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রশীদ আলকিরমানী (৫৬৫ হি.)

''জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া''র কিতাবুস সওমে ''আলবাবুছ ছালিছে''র অধীনে আতা ইবনে হামযা সাদীর একটি ফতোয়া নকল করার পর তাঁর মন্তব্য-

وهذا إذا كان بين البلدتين لا يختلف المطالع بحيث يلزم أحدهما حكم الآخر.

অর্থাৎ এ বিধান ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন দুই শহরের অবস্থান এমন হবে যে, তাদের উদয়স্থল অভিন্ন থাকে, যার কারণে একের হুকুম অন্যের উপর লাযিম হয়।

আতা ইবনে হামযার ফতোয়া এই ছিল যে, এক শহরের কাযীর কাছে অন্য শহরের কাযীর সামনে প্রদত্ত সাক্ষ্যের বিষয়ে যদি দুইজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় এবং সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ পাওয়া যায় তাহলে এই কাযী সে অনুযায়ী ফয়সালা করবে।

এ ফতোয়ার উপর ইমাম রুকনুদ্দীন কিরমানী উপরোক্ত মন্তব্য লিখেছেন।

১১. সিরাজুদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল আভীশী (৫৬৯ হি.)

তিনি ''আলফতোয়াস সিরাজিয়্যাহ''য় এ সিদ্ধান্তই ব্যক্ত করেছেন। তিনি লেখেন-

أهل بلدة صاموا للرؤية ثلاثين يوما، وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوما للرؤية فعلى هؤلاء قضاء يوم إلا إذا كان بين البلدتين تباين بحيث تختلف المطالع.

এক শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখে ত্রিশ দিন রোযা রাখল অন্য শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখেই রাখল উনত্রিশ রোযা তাহলে এদেরকে একদিনের রোযা কাযা করতে হবে যদি না দুই শহরের মাঝে এমন পার্থক্য হয় যার দ্বারা উদয়স্থল আলাদা হয়ে যায়। (আলফাতাওয়াস সিরাজিয়্যাহ, পৃষ্ঠা : ১৬৯, প্রকাশনায় দারুল উলূম যাকারিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা)

১২. মালিকুল উলামা আলাউদ্দীন আলকাসানী (৫৮৭ হি.)

তাঁর কিতাব ''বাদায়েউস সানায়ে ফী তারতীবিশ শারায়ে'' ফিকহে ইসলামীর শীর্ষস্থানীয় কিতাবসমূহের একটি। এ কিতাবে তিনি আলোচিত মাসআলায় এ সিদ্ধান্তই ব্যক্ত করেছেন, যা অধিকাংশ বড় বড় হানাফী ফকীহের সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য লাযিম নয়। যার শিরোনাম তাঁরা এভাবে দিয়েছেন যে, উদয়স্থল আলাদা হলে তার ইতিবার করা চাই এবং এক জায়গার হুকুম অন্য জায়গায় প্রয়োগ না করা চাই।

যেহেতু কাসানীর এ সিদ্ধান্ত এতই প্রসিদ্ধ যে, একে শুধু তাঁর ও যায়লায়ীর সিদ্ধান্ত মনে করা হয়েছে, এ কারণে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারো উৎসাহ থাকলে বাদায়েউস সানায়ে (২/২২৪-২২৫, দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত) খুলে দেখতে পারেন।

ফিকহ-ফতোয়ার অনুশীলনে রত তলাবায়ে কিরামের খিদমতে এ কথাও আরজ করছি যে, হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানবী রাহ. (১৪২২ হি.) ''আহসানুল ফাতাওয়া''য় (৪/৪৯৫) ইমাম কাসানী রাহ.-এর বক্তব্যের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা সঠিক নয়। এটি

توجيه القول بما لا يرضى به القائل

এর আওতায় পড়ে। আহসানুল ফাতাওয়ার দাবি সঠিক হলে বাদায়ের ইবারত

فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر

না হয়ে এরূপ হত-

فيعتبر في أهل كل بلد حكم قاضيهم دون البلد الآخر.

তিনি ইমাম কাসানীর বক্তব্যকে যে মাসআলার দিকে নিতে চেয়েছেন তা তো 'বাদায়ে'-তে আলোচনায়ই আসেনি। সুতরাং এ প্রয়াস অর্থহীন। কাসানী এখানে যে বিষয়টি আলোচনা করছেন তা হচ্ছে কোন ক্ষেত্রে উনত্রিশওয়ালাদের উপর ত্রিশওয়ালাদের কারণে এক দিনের কাযা ওয়াজিব হবে, কোন ক্ষেত্রে হবে না। তিনি পরিষ্কার বলেছেন, উদয়স্থল আলাদা হলে কাযা ওয়াজিব নয়। কারণ এ অবস্থায় এক শহরের জন্য অন্য শহরের হুকুম অবশ্য-অনুসরণীয় নয়।

এখানে এ বিষয়ে একটু ইশারা করা হল। 'চাঁদ প্রমাণিত হওয়া' এবং চাঁদের হুকুম প্রয়োগ' শীর্ষক আলোচনায় ''আহসানুল ফাতাওয়া''র ব্যাখ্যার ত্রুটি আরো পরিষ্কার হবে ইনশাআল্লাহ।

১৩. বুরহানুদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর আলমারগীনানী (৫৯৩ হি.)

হেদায়া-গ্রন্থকারের ইলমী অবস্থান কারো অজানা নয়। তাঁর কিতাব ''আততাজনীসু ওয়াল মাযীদ''-এর বরাতে তাঁর বক্তব্য ইতিমধ্যে দুইবার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে তাঁর কিতাব ''মুখতারাতুন নাওয়াযিল''-এর ইবারত (উদ্ধৃতি)ও উল্লেখ করছি। ঐ কিতাবের ইবারত ''তিবয়ানুল আদিল্লাহ ফী ইছবাতিল আহিল্লা''য় (পৃষ্ঠা : ১৩) নকল করা হয়েছে। তাতে আছে-

وقال في مختارات النوازل : أهل بلد صاموا تسعة وعشرين يوما بالرؤية وأهل بلدة أخرى صاموا ثلاثين يوما بالرؤية، على الأولين قضاء يوم إذا لم تختلف المطالع بينهما، وأما إذا اختلفت المطالع لا يجب القضاء ... .

এ উদ্ধৃতির অর্থও তাই যা ''আততাজনীসু ওয়াল মাযীদ''-এর উদ্ধৃতির অর্থ।****

১৪ ও ১৫. জহীরুদ্দীন আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আল বুখারী (৬১৯ হি.)

তাঁর কিতাব ''আলফাতাওয়ায যহীরিয়্যাহ'' ও ''আলফাওয়াইদুয যহীরিয়্যাহ'' খুবই প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বরাত-গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত। তিনি ইমাম যহীরুদ্দীন আলহাসান ইবনে আলী আলমারগীনানীর শাগরিদ ছিলেন এবং সম্ভবত তাঁরই নামানুসারে নিজের কিতাবের নাম রেখেছেন। তিনি 'আযযাহীরিয়্যাহ'র কিতাবুস সওম-এ এ মাসআলার উপর আলোচনা করেছেন, যার শুধু একটি বাক্য হিজরী অষ্টম শতকের ঐতিহাসিক ফতোয়া-সংকলন ''আলফাতাওয়াত তাতারখানিয়া''য় (৩/৩৬৫) (তাহকীক শাববীর আহমদ কাসেমী) নকল করা হয়েছে। এক প্রসঙ্গে ''আযযহীরিয়্যাহ''র 'কিতাবুল আইমান' (শপথ অধ্যায়)-এ-ও এ মাসআলার আলোচনা এসেছে। ওখানে তিনি যাকিছু লিখেছেন তা আল্লামা যাইন ইবনু নুজাইম ''আলবাহরুর রাইক'' কিতাবে নকল করেছেন। অপ্রাসঙ্গিক স্থানের এ বরাত আমাকে সরবরাহ করেছে আমাদের শাগরিদ মৌলভী ফয়জুল্লাহ হবিগঞ্জী। আলবাহরুর রাইক-এর 'কিতাবুল আইমান'-এর শেষে ''আযযহীরিয়্যাহ'' থেকে অনেক মাসআলা একসাথে নকল করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মাসআলা এই-

وسئل الأوزجندي عمن قال لصاحب الدين : إن لم أقض حقك يوم العيد فكذا، فجاء يوم العيد إلا أن قاضي هذه البلدة لم يجعله عيدا ولم يصل فيه صلاة العيد لدليل لاح عنده، وقاضي بلدة أخرى جعله عيدا؟

قال : إذا حكم قاضي بلدة بكونه عيدا يلزم ذلك أهل بلدة أخرى إذا لم تختلف المطالع، كما في الحكم بالرمضانية.

যহীরিয়্যাহ-লেখক বলেন, উযাজান্দীকে জিজ্ঞাসা করা হল, কেউ তার ঋণদাতাকে বলল, ঈদের দিন তোমার ঋণ আদায় না করলে এই হবে (কোনো কসম করল)। এখন ঈদ এমন হল যে, সে যে শহরের অধিবাসী সেখানের কাযী কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে ঈদ ঘোষণা করা থেকে বিরত থাকল, কিন্তু অন্য কোনো শহরের কাযী ঈদ ঘোষণা করল। (তাহলে কোন দিন ঈদের দিন গণ্য হবে এবং এ লোকের কসমের কী হবে)।

উযাজান্দী রাহ. জবাব দিলেন, উপরোক্ত দুই শহরের উদয়স্থল যদি অভিন্ন হয় তাহলে এক শহরের কাযীর ঘোষণা অন্য শহরের জন্যও অবশ্য-অনুসরণীয় হবে। রমযান শুরুর ঘোষণার ক্ষেত্রেও এ মাসআলা। (আলবাহরুর রাইক, ইবনে নুজাইম মিসরী ৪/৬১৫)

এ 'উযাজান্দী' কে?

উযাজান্দের অধিবাসীদের মাঝে দুজন ফকীহই প্রসিদ্ধ। এক. কাযী খান রাহ. (৫৯২ হি.), যিনি ফতোয়া খানিয়ার লেখক। দুই. তাঁর দাদা শামসুল ইসলাম মাহমূদ উযাজান্দী রাহ.। কাযী খান তো কাযীখান নামেই মশহূর। আর 'উযাজান্দী' বলে সাধারণত তাঁর দাদাজানকেই নির্দেশ করা হয়। ''খুলাসাতুল ফাতাওয়া'' ও ''আলমুহীতুল বুরহানী''র কয়েক জায়গায় এ নিসবত দ্বারা তাঁকেই বোঝানো হয়েছে।

সুতরাং ''যহীরিয়্যাহ''র উপরোক্ত মাসআলা থেকে যেমন আল্লামা জহীরুদ্দীন বুখারী রাহ. (৬১৬ হি.)-এর মত জানা গেল তেমনি শামসুল ইসলাম ইমাম মাহমূদ উযাজান্দী রাহ.-এর মতও জানা গেল। আরো জানা গেল যে,ফাতাওয়া খানিয়া'য় নাতী উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় বললেও দাদা ধর্তব্যই বলেছেন।

১৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাহমূদ আলমাওসিলী (৫৯৯ হি.-৬৮৩ হি.)

তিনি ''আলমুখতার'' গ্রন্থে খানিয়ার অনুসরণে প্রসিদ্ধ কওলটি লিখলেও ''আলমুখতার''-এর স্বরচিত ভাষ্য ''আলইখতিয়ার''-এ (১/৪০৫) ''আলফাতাওয়াল হুসামিয়্যাহ''র বরাতে ঐ মাসলাক নকল করেছেন, যা তাঁর আগের ফকীহরা লিখেছেন এবং যা হেদায়া-লেখক প্রমুখ ফকীহগণ বারবার বলেছেন।

''আলফাতাওয়াল হুসামিয়্যা'' দ্বারা উদ্দেশ্য হুসামুদ্দীন শহীদ রাহ. (৫৩৬ হি.)এ-র ফাতাওয়া। তাঁর ''আলফাতাওয়াল কুবরা''র ইবারত তো আমরা ইতিপূর্বে লিখেছি।

ফকীহ আবদুল্লাহ আলমাওসিলী তাঁর আলোচনা নিম্নোক্ত বাক্যে সমাপ্ত করেছেন-

وعن عائشة رضي الله عنها : فطر كل بلدة يوم فطر جماعتهم وأضحى كل بلدة يوم يضحي جماعتهم.

অর্থাৎ আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, প্রত্যেক শহরের ঈদুল ফিতর তখনই হবে যখন শহরের অধিবাসীগণ ঈদ করবে এবং ঈদুল আযহাও তখন হবে যখন সে শহরের অধিবাসীগণ কুরবানী করবে।

(আলইখতিয়ার লি-তা'লীলিল মুখতার ১/৪০৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন)

অর্থাৎ নিজ শহরের অধিবাসীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ ঈদ বা কুরবানী করলে না তা অনুমোদিত, না গ্রহণযোগ্য।

১৭. ফখরুদ্দীন যায়লায়ী (৭৪৩ হি.)

একজন হলেন জামালুদ্দীন যায়লায়ী (৭৬২ হি.), যিনি ''নাসবুর রায়াহ লিআহাদীসিল হেদায়া''র লেখক। উদয়স্থলের ভিন্নতার প্রসঙ্গে যে যায়লায়ীর কথা আসে তিনি ইনি নন। তিনি ''নাসবুর রায়াহ'' লেখকের উস্তায ফখরুদ্দীন যায়লায়ী (৭৪৩ হি.)। ''কানযুদ দাকাইক''-এর বিখ্যাত শরহ ''তাবয়ীনুল হাকাইক'' এঁর রচনা।

এ মাসআলায় ''তাবয়ীনুল হাকায়েক'' গ্রন্থে তিনি শক্তিশালী দালীলিক আলোচনা করেছেন। তাঁর সে আলোচনা পরের অনেক লেখক স্ব স্ব গ্রন্থে নকল করেছেন। এখনকার তালিবে ইলমদের পূর্ববর্তীদের কিতাবসমূহ খোলার অভ্যাস কমে যাওয়ার কারণে এ কথা মশহূর হয়ে গেছে যে, হানাফীদের মধ্যে শুধু যায়লায়ী উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য মনে করেন। কেউ অনুগ্রহ করে এর সাথে কাসানীর নামটিও যুক্ত করেছেন। অথচ পাঠক দেখছেন, একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণেও যায়লায়ীর নাম কত নম্বরে এল।

১৮. ইবনে মালাক (৮০১ হি.) [আবদুল লতিফ ইবনে আবদুল আযীয ইবনে আমীনুদ্দীন ইবনে ফিরিশতা আলকিরমানী]

ফিকহ-ফতোয়ার অঙ্গনে এ নাম খুবই প্রসিদ্ধ ও আনন্দের। তিনি হাদীসের মশহূর কিতাব ''মাশারিকুল আনওয়ার''-এর শরহ ''মাবারিকুল আযহার'' নামে এবং ফিকহে হানাফীর কিতাব ''মাজমাউল বাহরাইন ওয়া মুলতাকান নাইয়েরাইন''-এরও শরহ লিখেছেন, যা ''শরহুল মাজমা লিবনে মালাক'' নামে প্রসিদ্ধ। ফাতাওয়া শামীতে এর বরাত অনেক জায়গায় এসেছে।

এ কিতাবের মাখতূতা রিয়াদের জামিয়াতুল মালিক সাউদে আছে। তাতে তিনি ২৯ ওয়ালাদের উপর ৩০ ওয়ালাদের কারণে এক রোযা কাযা করার বিধানকে-

هذا إذا كان بينهما تقارب في المطلع

(যখন দুই শহরের উদয়স্থল কাছাকাছি হয়)

শর্তের সাথে যুক্ত করেছেন এবং উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন-

هذا هو الأشبه

এ সিদ্ধান্তই শরীয়তের নীতিমালার সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। (মাখতূতা, পাতা : ৬৩)

১৯. ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান আলকাহিরীওছাহিবুল ফায়য' (৯২৩ হি.)

মুহাদ্দিস তকীউদ্দীন শুমুন্নী রাহ. থেকে ইলমে হাদীস হাসিল করেছেন এবং ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. থেকে ইলমুল ফিকহ ওয়াল ফতোয়া। হাদীসে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. থেকেও তাঁর ইজাযত আছে।-আযযওউল লামি, শামসুদ্দীন সাখাবী (৯০২ হি.), ১/৫৯-৬৪

তাঁর ফতোয়া-সংকলনের নাম, যা তিনি নিজে সংকলন করেছেন ''ফয়যুল মাওলাল কারীম আলা আবদিহী ইবরাহীম''।

ইবনে আবেদীন শামী লেখেন-

وقد قال في خطبته : وضعت في كتابي هذا ما هو الراجح والمعتمد، ليقطع بصحة ما يوجد فيه أو منه يستمد.

অর্থাৎ তিনি (আল্লামা ইবরাহীম রাহ. তাঁর ফতোয়া সংকলন 'ফয়যুল মাওলা'র) ভূমিকায় বলেছেন, এ কিতাবে আমি শুধু নির্ভরযোগ্য ও অগ্রগণ্য কওলসমূহ লিখেছি। যাতে এ কিতাবে যা কিছু পাওয়া যাবে তার বিশুদ্ধতার বিষয়ে আস্থা রাখা যায় এবং এর দ্বারা ফিকহ-ফতোয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য নেওয়া যায়। (রদ্দুল মুহতার ১/১০২)

ইবনে আবেদীন শামী রাহ. উদয়স্থলের ভিন্নতা সংক্রান্ত আলোচনায় লেখেন, ফয়েয-লেখক ঐ সিদ্ধান্তকেই নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন যার উপর যায়লায়ী আস্থা রেখেছেন।

(واعتمده الزيلعي وصاحب الفيض)

২০. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (১১৭৬ হি.)

তিনি 'মুয়াত্তা মালিকে'র ফার্সী শরহ ''আলমুসাফফা''য় এ মাসলাকই অবলম্বন করেছেন। তিনি লেখেন-

اگر ہلال را در يك شہر ديده شد ودر شہر ديگر تفحص كردند ونديدند اگر آں شہر قريب است لازم است حكم رويت ايشاں، واگر بعيد است لازم نيست بحديث ابن عباس، وبقياس بر مسئلہ فطر وحج كہ در حديث منصوص شده.

وظاہر آنست كہ مراد از بعد مسافت قصر است، وايراد كرده نشود كہ مسافت قصر را بامر ہلال ہيچ تعلق نيست زيرا كہ مشروعيت اكتفائے ہر ناحيہ برويت خود از جہت حرج است در تكليف بابلاغ اخبار نہ از جہت اختلاف مطالع، وعادت قاضيہ است ببلوغ اخبار در مواضع قريبہ، بس اگر از آخر شہرے كہ در آں رويت متحقق شد بر دو مرحلہ باشد حكم آں لازم نيست.

(মুসাফফা শরহে মুয়াত্তা, ফার্সী ১/২৩৭, ১২৯৩ হিজরীর মুদ্রণের ফটোসংস্করণ, প্রকাশক, মীর মুহাম্মাদ করাচী)

এ উদ্ধৃতিতে শাহ ছাহেব রাহ. পরিষ্কার বলেছেন, দূর-দূরান্তের দুই শহরের ক্ষেত্রে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় নয়। এরপর তিনি এ বিধানের হিকমত এবং দূরত্বের পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যা এ মুহূর্তে আলোচ্য বিষয় নয়।

২১. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (১৩৫২ হি.)

শাহ ছাহেব কাশ্মীরী রাহ. ফিকহ-হাদীস-তাফসীর বিষয়ে বিগত শতাব্দীর ইমাম গণ্য হতেন। তিনি অত্যন্ত তাকীদের সাথে যায়লায়ীর মাসলাকের সমর্থন করেছেন। জামে তিরমিযীর উপর তার দরসী আলোচনা ''আলআরফুশ শাযী'' নামে তিরমিযীর হাশিয়ায় মুদ্রিত। সেখানে তাঁর আলোচনা দেখা যেতে পারে।

২২. মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. (১৩৯৬ হি.)

বহু বছর দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতী আযম ছিলেন। স্বাধীনতার পর পাকিস্তান তাশরীফ নিয়ে যান এবং আমৃত্যু পাকিস্তানের মুফতী আযম ছিলেন। এ বিষয়ে তার কিতাব ‘‘রুয়তে হেলাল’’ মুদ্রিত, যার বাংলা তরজমাও হয়েছে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ তা পাঠ করে দেখতে পারেন, কী জোরের সাথে তিনি যায়লায়ী ও কাসানীর মাসলাকের সমর্থন করেছেন।

২৩. মুহাম্মাদ ইউসুফ বানূরী (১৩৯৭ হি.)

গত শতাব্দীর অনেক বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ। আরব-আজমে সমান বরণীয়। জামি তিরমিযীর উপর তাঁর পান্ডিত্যপূর্ণ ভাষ্যগ্রন্থ ‘‘মাআরিফুস সুনান’’ মুদ্রিত ও সহজলভ্য। এর পঞ্চম খন্ডে কিতাবুস সওমের পঞ্চম ও নবম পরিচ্ছেদের (বাবের) অধীনে অতি বিজ্ঞতাপূর্ণ আলোচনা করেছেন এবং যায়লায়ীর মাসলাকের জোরালো সমর্থন করেছেন। তলাবায়ে কেরাম তা পাঠ করতে পারেন। (মাআরিফুস সুনান ৫/৩৩৫-৩৪১, ৩৫১-৩৫৪)

আপাতত এ সংক্ষিপ্ত তালিকার উপরই ক্ষান্ত করছি। আশা করি, এ থেকেই পাঠকবৃন্দ বাস্তব অবস্থা অনুমান করতে পারবেন।

এ তালিকার উপর নজর বুলিয়ে গেলেও জানা যাবে যে‘ইখতিলাফে মাতালি’ (উদয়স্থলের ভিন্নতা) সংক্রান্ত আলোচনায় হানাফী মাযহাব বর্ণনার সময় নির্দ্বিধায় এ কথা বলে দেওয়া যে, এ মাযহাবের ‘জাহের রেওয়ায়েত’ হচ্ছে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়া, যেন এটিই একমাত্র অগ্রগণ্য মাসলাক, খুবই আপত্তিকর।

তেমনি এই অভিমত দাঁড় করানোও বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিরোধী যে, মুতাকাদ্দিমীন-মুতাআখখিরীন তথা আগের ও পরের ফকীহগণের মাঝে যেন শুধু কাসানী ও যায়লায়ীই উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য মনে করেন। ইনসাফের দাবি হচ্ছে এমন বলা :

১. হানাফী মাযহাবের ‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’য় উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া না-হওয়া কোনোটাই আলোচনায় আসেনি।

২. নাদির রেওয়ায়েতে ৩০ ওয়ালাদের কারণে ২৯ ওয়ালাদেরকে যে এক রোযা কাযা করতে বলা হয়েছে তাকে অধিকাংশ বড় বড় হানাফী ফকীহ, যাদের মাঝে আছেন হানাফী মাযহাবের বড় বড় ইমাম, কাছাকাছি শহর-নগরের বিধান মনে করেন।

৩. لا عبرة لاختلاف المطالع

(উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়) শীর্ষক মূলনীতিধর্মী বাক্যের খোঁজ হানাফী মাযহাবে পঞ্চম শতক পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ষষ্ঠ শতকের শেষে সবার আগে খানিয়া ও খুলাসা-লেখক এ বাক্য ব্যবহার করেন।

৪. বক্তার সংখ্যা ও ইলমী অবস্থানের বিচারে দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য লাযিম না হওয়ার সিদ্ধান্তই হানাফী মাযহাবের রাজিহ-অগ্রগণ্য সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত হওয়ার হকদার এবং আকাবির মুতাকাদ্দিমীন তথা পূর্বসূরীদের মাঝে বড় বড় ফকীহগণ এ মাসলাকই গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা হায়াতে রাখলে অবশিষ্ট কথা আগামী সংখ্যায় হবে ইনশাআল্লাহ। □

وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب

টীকা

* এখানে মনে রাখা দরকার যে‘যাহিরুর রিওয়ায়াহ’র প্রসিদ্ধ পরিভাষা হল, ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.-এর ছয় কিতাবের কোনোটিতে (মূলত পাঁচ কিতাব, কেননা ‘‘আসসিয়ারুস সগীর’’ কিতাবটি ‘কিতাবুল আছল’-এর অংশ।) মাসআলাটি উল্লেখিত হওয়া, আর এ হিসেবেই উপরের পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ‘খানিয়া’ ও ‘খুলাসা’য় এ শব্দ অন্য কোনো অপ্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহার করা হলে তা আমাদের জানা নেই। তবে এ কথা স্মরণ রাখা জরুরি যে‘যাহিরুর রিওয়ায়াহ’ হওয়া-যা প্রাধান্যের একটি কারণ-তা এই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ অর্থ হিসেবেই।

** ইমাম কুদূরী রাহ.-এর উস্তায আবু আবদুল্লাহ জুরজানী ছাড়াও হানাফী ফকীহগণের মাঝে আরও একজন জুরজানী নামে পরিচিত। যিনি প্রথমোক্ত জুরজানী থেকে পরের ও ‘খিযানাতুল আকমাল’ কিতাবের লেখক।

খিযানাতুল আকমালে সওম অধ্যায়ে ‘ইখতিলাফে মাতালি’-এর পক্ষে-বিপক্ষে কিছুই নেই।

‘খিযানাতুল আকমাল’-এর ভূমিকায় লেখক ইউসুফ ইবনে আলী জুরজানী রাহ. নিজেই লিখেছেন যে‚তিনি এই কিতাবটি ৫২২ হিজরীর ঈদুল আযহায় শুরু করেছেন।’’ কাশফুয যুনূন কিতাবেও তাঁর উদ্ধৃতিতে এই তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং একথা বলা ঠিক নয় যে‚খিযানাতুল আকমাল’-এর লেখক হলেন আবুল হাসান কারখী (৩৪১ হি.)-এর শাগরিদ। আর এ কথার পক্ষে ‘তাজুত তারাজিম’-এর সম্পাদকের সমর্থন শুধু অনুমান নির্ভর। খিযানা কিতাবে পঞ্চম শতাব্দীর কিতাবসমূহের অনেক উদ্ধৃতি রয়েছে।

হেদায়া ও বাদায়ে কিতাবে صفة الصلاة এর আলোচনায় كذا في تخريج الجرجاني কথাটি উল্লেখ আছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ইমাম কুদূরীর উস্তায আবু আবদুল্লাহ জুরজানী, ইউসুফ ইবনে আলী জুরজানী নয়। আর বাদায়ের সম্পাদক এখানে বিষয়টি গোলমাল করে দিয়েছেন। তাই এ থেকে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

*** এখানে এই সংশয় হওয়া উচিত নয় যে‚আততাজরীদুর রুকনী’’র লেখকের মৃত্যুসন ৫৪৩ হি. বলা হয়েছে। অথচ ‘খুলাসাতুল ফাতাওয়া’র লেখকের মৃত্যুসন ৫৪২ হিজরী। তাহলে এঁরা দুজন সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও এটা কিভাবে হয় যে, তিনি এত অধিক পরিমাণে তাঁর উদ্ধৃতি উল্লেখ করবেন?

এই সংশয়ের কোনো ভিত্তি নেই। প্রথমত এ কারণে যে, খুলাসায় এমন অনেক কিতাবের উদ্ধৃতি আছে, যে সকল কিতাবের লেখক খুলাসা-লেখকের সমকালীন ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুসন ছিল ৬শ হিজরীর পরে কিংবা কিছু আগে। যেমন তাতে ‘মুহীত’ ও ‘যখীরাহ’র উদ্ধৃতি আছে। বিভিন্ন উদ্ধৃতি মিলিয়ে দেখা গেছে তা ‘আলমুহীতুল বুরহানী’র উদ্ধৃতি। আর ‘যখীরাহ’ তো আলমুহীতুল বুরহানীর লেখকেরই কিতাব, যার মৃত্যুসন ৬১৬ হিজরী বলা হয়েছে।

এমনিভাবে যানদাবিসাতীর ‘আররওযা’ ও ওস্তরুশনীর ‘আলফুসূলে’র হাওয়ালা সম্পর্কেও ভেবে দেখুন।

এমনিভাবে ‘খুলাসা’তে ‘ফাতাওয়া খানিয়া’ থেকে খুব নকল করা হয়েছে এবং কাযীখানের ‘আলজামিউস সগীর’-এর শরহ থেকেও নকল করা হয়েছে। অথচ কাযীখানের মৃত্যুসন হল ৫৯২ হিজরী। খুলাসার মুসান্নিফ ও কাযীখান পরস্পর আত্মীয়ও। খানিয়ার মুসান্নিফ হলেন তাঁর মামাতো ভাই। যে ভঙ্গিতে ও যে পরিমাণে তিনি কাযীখান রাহ.-এর হাওয়ালা উল্লেখ করেছেন তাতে এটাই মনে হয় যে, কাযীখান রাহ.কে তিনি মুরববী মনে করতেন। বয়সের দিক থেকে কে বড় তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন।

‘আততাবাকাতুস সানিয়্যাহ’-এর লেখক কারো থেকে একটি বিচ্ছিন্ন সূত্রে একটি উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন, যাতে খুলাসার মুসান্নিফের জন্মসন ৪৮১ বা ৪৮২ হিজরী বলা হয়েছে। আর তার মৃত্যুসন ৫৪২ হিজরী। ‘কাশফুয যুনূনে’ও তার মৃত্যুসন ৫৪২ হিজরীই উল্লেখ করেছেন। এ সকল সন-তারিখের ভিত্তিতে ধারণা ছিল যে, খুলাসার লেখক বয়সের দিক থেকে কাযীখানের বড়। কিন্তু উপরোক্ত বাস্তবতার আলোকে খুলাসার মুসান্নিফ রাহ.-এর জন্ম ও মৃত্যুসন দু’টোই আরো অনুসন্ধানের দাবি রাখে।

তেমনিভাবে ইসমাঈল পাশা বাগদাদী রাহ. ‘‘হাদিয়াতুল আরেফীনে’’ ‘আলমুহীতুল বুরহানীর মুসান্নিফের জন্মসন ৫৫১ হিজরী লিখেছেন। এটিরও তাহকীক প্রয়োজন। কারণ কাফাবী রাহ. তার উস্তাযগণের তালিকায় তাঁর চাচাজান হুসামুদ্দীন শহীদকেও উল্লেখ করেছেন, যিনি ৫৩৬ হিজরীতে শাহাদত বরণ করেছেন।

যাইহোক, এখানে আমার উদ্দেশ্য শুধু এটুকু বলা যে, আততাজরীদুর রুকনীর লেখকের মৃত্যুসন ৫৪৩ হিজরী হওয়ার কারণে এই সন্দেহের কোনো সুযোগ নেই যে, তা খুলাসাতুল ফাতাওয়ার মাসদার/উৎসগ্রন্থ কীভাবে হতে পারে?

**** তলাবায়ে কেরামের আরো অবগতির জন্য এখানে এ কথাও বলতে চাইওতিবয়ানুল আদিল্লা’র মধ্যে হেদায়ার মুসান্নিফের কিতাব ‘মুখতারাতুন নাওয়াযিল’ এর উদ্ধৃতিতে যে ইবারত উল্লেখ করা হয়েছে শব্দের কিছু ভিন্নতার সাথে তা আবুল লাইছ সমরকন্দীর নামে প্রকাশিত কিতাব ‘‘ফাতাওয়ান নাওয়াযিলে’’ও বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই প্রকাশিত কিতাব আবুল লাইছ রাহ.-এর নয়। আবুল লাইছ রাহ.-এর কিতাবের যে পরিচিতি ‘‘কাশফুয যুনূন’’ ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত হয়েছে তার সাথে এর কোনো মিল নেই। শতবর্ষ পূর্বে কেউ একটি মাখতূতা পেয়েছিল। কিন্তু তাতে وجادة صحيحة এর শর্তগুলো পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও হিন্দুস্তানের কোনো প্রকাশক তা প্রকাশ করেছেন। আর সেই সংস্করণ থেকেই মীর মুহাম্মাদ করাচী ফটো সংস্করণ প্রকাশ করেন। আর দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত তা কম্পোজ করে প্রকাশ করে।

আবুল লাইছের কিতাব ‘‘আননাওয়াযিল’’ এখনও মাখতূত আকারে রয়েছে। ইস্তাম্বুলের মাকতাবায়ে ফয়যুল্লাহ ও মাকতাবায়ে দামাদ ইবরাহীম-এ এর সঠিক নুসখা বিদ্যমান আছে। হায়দারাবাদ আসফিয়্যাহ ও লাজনাতু ইহইয়াইল মাআরিফিন নুমানিয়্যাহয় দামাদ ইবরাহীম-এর নুসখার ফটোকপি সংরক্ষিত আছে। আর জামিআ উম্মুল কুরাতে উভয় নুসখার ফটোকপি আছে। মাওলানা মুশতাক আহমদ হায়দারাবাদের নুসখার সিডি সংগ্রহ করেছেন। আর শায়খ ত্বহা উম্মুল কুরার উভয় নুসখা থেকে কিতাবুস সওম-এর ফটোকপি পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের উভয়কে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

নাওয়াযিল আবুল লাইছ রাহ.-এর উভয় সহীহ নুসখা মুতালাআ করা হয়েছে। তাতে আলোচিত মাসআলা নেই।

কোনো কোনো গবেষক এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, প্রকাশিত ফাতাওয়ান নাওয়াযিল মূলত ছাহিবে হেদায়ার কিতাব মুখতারাতুন নাওয়াদির। তবে বিষয়টি আরো অনুসন্ধানের দাবি রাখে।

শাফেয়ী মাযহাব

আলোচিত মাসআলায় হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়েছে। আরো কিছু কথা সামনের শিরোনামগুলোর অধীনেও হবে ইনশাআল্লাহ। এখন অন্য তিন মাযহাবের (শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী) ফকীহগণের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা মুনাসিব মনে হচ্ছে।

প্রথমে শাফেয়ী মাযহাব। তবে তা বর্ণনার আগে ভূমিকা হিসেবে এটুকু বলে নিচ্ছি যে, শাফেয়ী মাযহাবের ফিকহের কিতাবগুলোর পরিভাষায় ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর সিদ্ধান্তগুলোকে 'ক্বওল' (قول) ব.ব আকওয়াল (أقوال) বলে। আর মাযহাবের অনুসারী ও ভাষ্যকার ইমামদের ইস্তিমবাতকৃত মতামতকে 'ওয়াজহ' (وجه) ব.ব 'উজূহ' (وجوه) বলে। 'আকওয়াল' বা 'উজূহ' বর্ণনার ক্ষেত্রে মাযহাবের ফকীহগণের মাঝে পার্থক্য বা বিভিন্নতা দেখা দিলে একে 'তরীক' (طريق) বলে।

শাফেয়ী মাযহাবের বর্ণনা ও উপস্থাপনা এবং ব্যাখ্যা ও দলিল-নির্দেশের ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে দুটি বড় 'তরীকা' আছে : 'তরীকাতুল ইরাকিয়ীন' (ইরাকীগণের তরীকা) ও 'তরীকাতুল খুরাসানিয়ীন' (খুরাসানীগণের তরীকা)। প্রথম তরীকার শায়খ (প্রধান) হলেন আবু হামিদ আসফারাইনী (৩৪৪-৪০৬ হি.)। আর দ্বিতীয় তরীকার শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ কাফফাল মারওয়াযী (৪১৭ হি.)। (আলমাজমূ শরহুল মুহাযযাব, ইমাম নববী, ভূমিকা; তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা, তাজুদ্দীন সুবকী ৫/৫৪)

ভূমিকার পর এবার মূল প্রসঙ্গ

শাফেয়ী ফকীহগণ আলোচিত মাসআলায় (এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় কি না) শুধু 'উজূহ' বর্ণনা করেছেন৷আকওয়াল' বর্ণনা করেননি। এর অর্থ, তাঁরা এ মাসআলা ইমাম শাফেয়ীর কিতাবসমূহে পাননি এবং ইমাম শাফেয়ী রাহ. থেকে তাদের কাছে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত পৌঁছেনি। তাঁদের কাছে শুধু আছে ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর অনুসারী ফকীহ ইমামগণের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত।

ইমাম শাফেয়ী রাহ. থেকে এ মাসআলা স্পষ্টভাবে বর্ণিত না হওয়ার এক বড় আলামত এ-ও যে, শাফেয়ী মাযহাবের সবচেয়ে বড় সহায়তাকারী ইমাম বায়হাকী রাহ.-এর কিতাব ''মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার''-এ (যার

বিষয়বস্তুই হচ্ছে ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর সিদ্ধান্তসমূহের দলিল উল্লেখ করা) আমাদের জানা মতে, এ মাসআলার উল্লেখ নেই। এখন দেখার বিষয় এই যে, শাফেয়ী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ কোন দিকে। সাইমারী ও আবুত তাইয়েব তবারীসহ কতিপয় মনীষী যদিও বলেন, এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্যও অবশ্যঅনুসরণীয়, কিন্তু অধিকাংশ শাফেয়ী ফকীহর সিদ্ধান্ত এই যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় না হওয়াই সঠিক। তবে নিকট ও দূরের মাপকাঠি সম্পর্কে শাফেয়ী ফকীহ ও অন্যান্য ফকীহগণের বিভিন্ন মত আছে। ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে পরে আলাদাভাবে আলোচনা হবে। শাফেয়ী মাযহাবের সর্বসম্মত মুখপাত্র ইমাম আবু যাকারিয়া নববী রাহ. (৬৭৬ হি.) ''শরহুল মুহাযযাবে'' লেখেন-

إذا رأوا الهلال في رمضان في بلد ولم يروه في غيره، فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف، وإن تباعدا فوجهان مشهوران في الطريقتين :

أصحهما : لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر، وبهذا قطع المصنف والشيخ أبو حامد والبَنْدَنِيْجِي وآخرون، وصححه العَبْدَرِي والرافعي والأكثرون.

والثاني : يجب، وبه قال الصيمري، وصححه القاضي أبو الطيب، والدارمي، وأبو علي السِّنْجِي وغيرهم.

অর্থ, এক শহরের লোকেরা রমযানের চাঁদ দেখেছে, অন্য শহরের লোকেরা দেখেনি এক্ষেত্রে শহর দুটি কাছাকাছি হলে তা এক শহরের মতো গণ্য হবে। সুতরাং দ্বিতীয় শহরের অধিবাসীদেরও রোযা রাখা জরুরি হবে। এতে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু যদি দুই শহর পরস্পর দূরবর্তী হয় তাহলে এক্ষেত্রে দুই 'তরীকায়' দুটি প্রসিদ্ধ 'ওয়াজহ' রয়েছে : অধিকতর শুদ্ধ 'ওয়াজহ' এই যে, (এক শহরে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কারণে) অন্য শহরের অধিবাসীদের উপর রোযা রাখা জরুরি হবে না। গ্রন্থকার (আবু ইসহাক শীরাজী), শায়খ আবু হামিদ, বান্দানীজী ও অন্যরা নিশ্চিতভাবে এ কথাই বলেছেন। (অর্থাৎ অন্য মতের উল্লেখও করেননি) আবদারি ও রাফেয়ীসহ অধিকাংশ মনীষী একেই সহীহ বলেছেন।

'দ্বিতীয় 'ওয়াজহ' এই যে, রোযা রাখা জরুরি হবে। সাইমারী তা বলেছেন এবং কাযী আবুত তাইয়্যেব, দারিমী ও আবু আলী ছিনজী প্রমুখ একে সহীহ বলেছেন। (আলমাজমূ শরহুল মুহাযযাব ৭/৪২৭, দারুল হাদীস, কাহেরা)

ইমাম নববী রাহ. এখানে শুধু الأكثر। নয়; বরং বহুবচন الأكثرون। ব্যবহার করেছেন। এ থেকে অনুমান করা যায়, কী বিপুলসংখ্যক শাফেয়ী ফকীহ ঐ সিদ্ধান্তকে সঠিক বলেছেন। 'আলমাজমূ'-এর পূর্ণ আলোচনা, যা এখানে নকল করা হয়নি এবং ফিকহে শাফেয়ীর অন্যান্য কিতাব থেকে এ আলোচনা আদ্যোপান্ত পড়া হলে দেখা যাবে, শাফেয়ী মাযহাবের উভয় ঘরানা 'ইরাকী তরীকা' ও 'খুরাসানী তরীকা'র অধিকাংশ ফকীহ এ মতই গ্রহণ করেছেন। আর উভয় ঘরানার শায়খ (প্রধান) আবু হামিদ আসফারাইনী রাহ ও কাফফাল মারওয়াযী রাহ.-এর অবস্থানও তাই।

'আলমাজমূ' তো ইমাম আবু ইসহাক শীরাজী (৩৯৩ হি.-৪৭৬ হি.) কৃত 'আলমুহাযযাব'-এর ভাষ্যগ্রন্থ, ৬আলমুহাযযাব'-এর মতো ফিকহে শাফেয়ীর দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কিতাব ইমাম গাযালী রাহ.-এর 'আলওজীয'। এর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভাষ্যগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয় ইমাম আবদুল কারীম রাফেয়ী (৬২৩ হি.)-এর 'ফাতহুল আযীয', যা 'আশশরহুল কাবীর' নামে প্রসিদ্ধ।

শাফেয়ী মাযহাবে রাফেয়ী ও নববীকে ‘শায়খাইন’ উপাধিতে স্মরণ করা হয় এবং এঁদের সম্মিলিত মতামত (متفقه تصحيح وترجيح) কে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে পাঠক নববী রাহ.-এর আলোচনা পাঠ করেছেন। এবার রাফেয়ীর বক্তব্য দেখুন-

إذا رئي الهلال في بلدة ولم ير في أخرى نظر، إن تقاربت البلدتان فحمهما حكم البلدة الواحدة، وإن تباعدتا فوجهان : أظهرهما، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وهو اختيار الشيخ أبي حامد أنه لا يجب الصوم على أهل البلدة الأخرى ...

والثاني : يجب، وهو اختيار القاضي أبي الطيب، ويروى عن أحمد ...

এক শহরে চাঁদ দেখা গেল, অন্য শহরে দেখা গেল না এ অবস্থায় দেখতে হবে : যদি শহর দুটি কাছাকাছি হয়, তাহলে দুটোকে এক শহরের মতো গণ্য করা হবে। (অর্থাৎ এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্যও অবশ্যঅনুসরণীয় হবে) আর যদি শহর দুটি পরস্পর দূরবর্তী হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে দুটি ‘ওয়াজহ’ রয়েছে : অধিক জাহির (অর্থাৎ দলিলের বিচারে অধিক স্পষ্ট এবং গ্রহণকারীর সংখ্যার বিচারে অধিক প্রসিদ্ধ) ‘ওয়াজহ’ এই যে, দ্বিতীয় শহরের অধিবাসীদের রোযা রাখা জরুরি হবে না। আবু হানীফা রাহ. এ-ই বলেছেন এবং শায়খ আবু হামিদও তা গ্রহণ করেছেন।

‘দ্বিতীয় ওয়াজহ’ এই যে, রোযা রাখা জরুরি হবে। কাযী আবুত তাইয়েব তা গ্রহণ করেছেন আর আহমদ রাহ. থেকেও তা বর্ণিত।”

(ফাতহুল আযীয শরহুল ওয়াজীয, আবদুল করীম রাফেয়ী, কিতাবুস সওম ৩/১৭৯-১৮০)

রাফেয়ী রাহ.-এর বৃত্তান্ত থেকে এ-ও বোঝা গেল, কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে সব ইমাম একমত যে, এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয়। মতভেদ দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে।

তেমনি এ-ও জানা গেল যে, মতভেদের ক্ষেত্রে শাফেয়ী মাযহাবের ‘আযহার’ তথা বেশি যাহির ও অগ্রগণ্য মত, যা তা ইমাম রাফেয়ীর দৃষ্টিতে ইমাম আবু হানীফারও মত। তবে আমার জানা নেই, আবু হানীফার এ মত তিনি কোথায় পেয়েছেন। না কি তার উদ্দেশ্য এ কথা বলা যে, হানাফী মাযহাবেরও অগ্রগণ্য মত এটি। অর্থাৎ ‘আবু হানীফা’ বলে তিনি ‘হানাফী মাযহাব’ নির্দেশ করেছেন।

ফিকহে শাফেয়ীর বহু গ্রন্থ মাশাআল্লাহ মুদ্রিত। সেসব থেকে নকল করতে থাকলে লেখা অনেক দীর্ঘ হয়ে পড়বে। তাই এখানে ফিকহে শাফেয়ীর কিছু কিতাবের শুধু বরাত উল্লেখ করছি। আগ্রহী পাঠক সেগুলো খুলে দেখতে পারেন।

1. ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ইমাম গাযালী শাফেয়ী (৪৫০-৫০৫ হি.)

ইমাম গাযালী রাহ.-এর এই কিতাব তো মাশাআল্লাহ আম-খাস, আলিম-বুদ্ধিজীবী সব মহলে সমান সমাদৃত। এতে (১/৩৩৮) সিয়ামের আলোচনায় প্রথম পরিচ্ছেদেই এ মাসআলা আছে। তিনি পরিষ্কার লিখেছেন-

إذا رؤي ببلدة ولم ير بأخرى وكان بينهما أقل من مرحلتين وجب الصوم على الكل، وإن كان أكثر كان لكل بلدة حكمها ولا يتعدى الوجوب.

2. আততাহযীব ফী ফিকহিল ইমামিশ শাফেয়ী, আবু মুহাম্মাদ হুসাইন ইবনে মাসউদ আলবাগাভী (৫১৬ হি.) (৩/১৪৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত, প্রথম প্রকাশ : ১৪১৮ হি., ১৯৯৭ ঈ.)

3. আলবায়ান ফী মাযহাবিল ইমামিশ শাফেয়ী (৩/৪৭৮, দারুল মিনহাজ, জিদ্দা), আবুল হুসাইন ইয়াহইয়া ইবনে আবিল খায়ের আলইমরানী আশশাফেয়ী (৪৮৯-৫৫৮)

4. রওযাতুত তালেবীন ওয়া উমদাতুল মুফতীন (২/৩৪৮), ইমাম নববী শাফেয়ী (৬৩১-৬৭৬ হি.)

5. তুহফাতুল মুহতাজ শরহুল মিনহাজ (৪/৫০৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত), ইবনে হাজার মক্কী হাইতামী শাফেয়ী (৯৭৪ হি.)

6. মুগনিল মুহতাজ শরহুল মিনহাজ (১/৫৬৯, দারুল ফিকর, বৈরুত), আলখতীবুশ শিরবীনী শাফেয়ী (৯৭৭ হি.)

7. নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ (৩/২৩৫-২৩৬, আলমাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যা, কায়রো), শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আররামলী শাফেয়ী (১০০৪ হি.)

মিনহাজ ফিকহে শাফেয়ীর নির্ভরযোগ্যতম 'মতন'। এর অনেক ভাষ্যগ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে 'তুহফাতুল মুহতাজ' ও 'নিহায়াতুল মুহতাজ' শাফেয়ী ফকীহগণের কাছে সবচেয়ে বেশি সমাদৃত। মিনহাজের অন্য অনেক শরহের মতো এ দুটোতেও আলোচিত মাসআলায় শায়খাইন (রাফেয়ী ও নববী)-এরই সহমত পোষণ করা হয়েছে।

8. আলফাতাওয়াল ফিকহিয়্যাহ, ইবনে হাজার মক্কী হাইতামী ২/৬০

9. আহকামুল কুরআন (১/৭০) ইলকিয়া আততবারী (৪৫০-৫০৪ হি.)

10. বাহরুল মাযহাব, আবুল মাহাসিন আররুয়ানী (৪১৫-৫০২ হি.)

শেষোক্ত দুই কিতাবের আলোচনা এখানে তুলে দেওয়া মুনাসিব মনে হচ্ছে। ইমাম ইলকিয়া তবারী (শামসুল ইসলাম আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইলকিয়া আলহাররাছী) ''আহকামুল কুরআনে'' লেখেন-

وأجمع أصحاب أبي حنيفة على أنه إذا صام أهل بلد ثلاثين يوما للرؤية، وأهل بلد تسعة وعشرين يوما، أن على الذين صاموا تسعة وعشرين قضاء يوم.

وأصحاب الشافعي لا يرون ذلك، إذ كانت المطالع في البلدان يجوز أن تختلف.

অর্থ, আসহাবে আবু হানীফার (অর্থাৎ হানাফী মাযহাবের ধারক-বাহক ফকীহবৃন্দের) ইজমা আছে যে, যদি কোনো শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখে ত্রিশ রোযা রাখে তাহলে যে শহরের অধিবাসীরা উনত্রিশ রোযা রেখেছে তাদেরকে একদিনের রোযা কাযা করতে হবে।

আর আসহাবে শাফেয়ী (অর্থাৎ শাফেয়ী মাযহাবের ধারক-বাহক ফকীহবৃন্দ) একে জরুরি মনে করেন না। কারণ দুই শহরের উদয়স্থলে পার্থক্য হতে পারে। (আহকামুল কুরআন, ইলকিয়া তবারী ১/৭০; আলজামি লিআহকামিল কুরআন, কুরতুবী ৩/১৫৭, আলবাকারা ২ : ১৮৫)

ইলকিয়া রাহ. আপন মাযহাব সম্পর্কে যা বলেছেন সে সম্পর্কে আমার কোনো মন্তব্য নেই। তিনিই তাঁর মাযহাব সম্পর্কে ভালো জানেন। কিন্তু আসহাবে আবু হানীফার বিষয়ে তিনি যা লিখেছেন সে সম্পর্কে মনে রাখতে হবে, এ মাসআলা শুধু আবু ইউসুফ রাহ. ও মুহাম্মাদ রাহ. থেকে বর্ণিত এবং অধিকাংশ বড় বড় হানাফী ফকীহ এ বিধানকে শুধু কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেন, যা ইতিপূর্বে নির্ভরযোগ্য বরাত সহকারে লেখা হয়েছে। আমার ধারণা, এখানে ইলকিয়া রাহ.-এর বিভ্রান্তি হয়েছে আবু বকর রাযী রাহ.-এর বক্তব্য থেকে। এ কারণে তিনি ব্যতিক্রমহীনভাবে 'আসহাবে আবু হানীফা'র সাথে একটি কথা সম্বন্ধ করে বলে দিয়েছেন যে, ঐ বিষয়ে সকলের ইজমা আছে।

মূল ঘটনা এই যে, জাসসাস রাহ. ''আহকামুল কুরআনে'' আল্লাহ তাআলার বাণী- فعدة من ايام اخر এর অধীনে দুটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন : এক. যে ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে রমযানে কোনো রোযা রাখতে পারেনি সে কয়দিনের রোযা কাযা করবে-উনত্রিশ না ত্রিশ।

দুই. কোনো শহরে ত্রিশ দিন রোযা রাখা হয়েছে তাহলে যারা উনত্রিশ রোযা রেখেছে তাদেরকে একদিনের রোযা কাযা করতে হবে কি না।

এই দুই মাসআলার বর্ণনা জাসসাস রাহ. এভাবে শুরু করেছেন-

... ذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف، وهشام عن محمد، من غير خلاف من أحد من أصحابنا، قالوا .

অর্থাৎ, বিশর ইবনুল ওয়ালীদ আবু ইউসুফ রাহ. থেকে, এবং হিশাম মুহাম্মাদ রাহ. থেকে বর্ণনা করেন-আর এ বিষয়ে আমাদের ইমামদের থেকে বিপরীত কোনো সিদ্ধান্ত বর্ণিত হয়নি-তাঁরা বলেন, ...।

এভাবে কথা শুরু করে জাসসাস মাসআলা দুটি বলেছেন যে, অসুস্থ ব্যক্তি যে শহরের অধিবাসী ঐ শহরের অধিবাসীরা যদি ২৯ রোযা রেখে থাকে তাহলে তাকেও উনত্রিশ রোযা কাযা করতে হবে। আর কোনো শহরে যদি চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ত্রিশ রোযা রাখা হয় এবং উনত্রিশওয়ালারা তা জানতে পারেন তাহলে তাদের একদিনের রোযা কাযা করা জরুরি। (আহকামুল কুরআন, জাসসাস ১/২২০)

জাসসাসের বক্তব্যের অর্থ, এ মাসআলা আবু ইউসুফ রাহ. ও মুহাম্মাদ রাহ. থেকে (নাদির রেওয়ায়েতে বিশর ও হিশামের সূত্রে) বর্ণিত হয়েছে। আর আমাদের অন্য কোনো ইমাম থেকে এ মাসআলা বর্ণিত না হলেও বিপরীত সিদ্ধান্ত তাদের থেকে বর্ণিত হয়নি। এ হচ্ছে তাঁর বক্তব্য। কিন্তু চিন্তা না করলে এ বক্তব্য পড়ামাত্র কারো মনে হতে পারে এর অর্থ,,আমাদের সকল ফকীহ এমনটা বলেছেন, কেউ এ বিষয়ে দ্বিমত করেননি।'' সম্ভবত ইলকিয়া রাহ.-এর এ বিভ্রান্তিই হয়েছে এবং এরই ভিত্তিতে তিনি এ কথাটিকে সকল হানাফী ফকীহর ইজমাকৃত মাসআলা বানিয়ে দিয়েছেন!!

অথচ জাসসাস রাহ.-এর উদ্দেশ্য কখনো এই নয় যে, এটি ফিকহে হানাফীর ইজমায়ী মাসআলা। এখানে ইলকিয়া রাহ.-এর এক 'তাসামুহ' তো এই যে, ইজমায়ী নয় এমন মাসআলাকে ইজমায়ী বানিয়ে দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় তাসামুহ এই যে, এ মাসআলা কি সকলস্থানের জন্য প্রযোজ্য, না শুধু কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে-এ দিকে

কোনো ভ্রুক্ষেপ করেননি। অথচ বড় বড় অনেক হানাফী ফকীহ একে শুধু কাছাকাছি শহর-নগরের বিধান মনে করেন।

যাহোক, বিষয়টি প্রসঙ্গক্রমে এসেছিল। আলোচনা হচ্ছিল শাফেয়ী মাযহাব সম্পর্কে, তো এ বিষয়ে ফিকহে শাফেয়ীর অন্যান্য উদ্ধৃতির মতো ইলকিয়া রাহ.-এর উপরোক্ত উদ্ধৃতিরও মূলকথা হচ্ছে, শাফেয়ী মাযহাবে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য।

এবার শুনুন আবুল মাহাসিন রুয়ানী রাহ.-এর 'বাহরুল মাযহাব'-এর বরাত। ফিকহে শাফেয়ীতে আবুল মাহাসিন রুয়ানীর মাকাম ও অবস্থান কী তা এ ঘটনা থেকেও অনুমান করা যায় যে, একবার তিনি আল্লাহর নেয়ামতের বর্ণনা হিসেবে বলেছেন-

لو احترقت كتب الشافعي لأ مليتها من حفظي

অর্থাৎ আল্লাহ না করুন, যদি শাফেয়ীর গ্রন্থাবলী পুড়ে ছাই হয়ে যায় তাহলে আমি তা নিজ স্মৃতি থেকে লিখিয়ে দিতে পারব। (তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ, তাজুদ্দীন সুবকী ৭/১৯৪)

তাঁর জন্ম ৪১৫ হিজরীতে। আর মৃত্যু ৫০২ হিজরীতে। আশুরার দিন জুমার আগে যখন তিনি ইমলার মজলিস থেকে ফারিগ হন ঐ সময় বাতেনী মালাউনেরা তাকে শহীদ করে দেয়।(**রাহিমাহুল্লাহ ওয়া রাযিয়া আনহু**)

তিনি ফিকহে শাফেয়ীর উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। জীবনের শেষের দিকে লিখেছেন 'বাহরুল মাযহাব গ্রন্থটি। এর ভূমিকায় তিনি লেখেন'মাযহাব' ও 'খিলাফিয়্যাত' বিষয়ে ছোট-বড় অনেক গ্রন্থ রচনা করেছি। পরে ইমামগণের আরো অনেক ফাওয়াইদ (মাসাইল ও দালাইল) সংগৃহীত হয়েছে। তো ইচ্ছে হল, জীবনের শেষদিকে এক কিতাবে আমার কথাগুলো একত্র করে দেই -

(أحببت أن أجمع كلامي في آخر عمري في كتاب واحد)

যাতে আমার জন্য জানা সহজ হয় যে, ঐ কিতাবগুলোতে কী আছে। আর এ গ্রন্থে আমি 'আসাহ' (أصح)-এর উপর নির্ভর করব। (অর্থাৎ অধিকতর বিশুদ্ধ 'কওল' ও 'ওয়াজহে'র উপর এ কিতাবের বুনিয়াদ হবে) আর এর নাম রাখছি 'বাহরুল মাযহাব।' (বাহরুল মাযহাব, রুয়ানী, ভূমিকা)

তাঁর এ প্রিয়তম গ্রন্থে তিনি লেখেন, (অর্থ) এক শহরের অধিবাসীগণ চাঁদ দেখল অন্য শহরের অধিবাসীরা দেখল না-যদি দুই শহরের মাঝে দূরত্ব এত কম হয় যে, উদয়স্থল আলাদা হয় না, যেমন বাগদাদ ও বসরা, তাহলে অন্য শহরের অধিবাসীদের উপরও ঐ শহরের চাঁদ দেখার কারণে রোযা ফরয হবে।

আর যদি দুই শহর দূর-দূরান্তের হয় যেমন ইরাক ও হিজায বা শাম ও খোরাসান, তাহলে আবু হামেদ (আসফারাইনী, ইরাকী তরীকার শায়খ) বলেন, এক্ষেত্রে এক শহরের অধিবাসীদের অন্য শহরের অধিবাসীদের চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করা জরুরি নয়। কাযী আবু হামেদ (আলমারওয়াররূযী, মৃত্যু : ৩৬২ হি.)ও এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ...।

এরপর রুয়ানী এর দলীল উল্লেখ করেছেন। অতপর কাযী আবুত তাইয়েব তবারীর সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন যে, এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য সর্বাবস্থায় অবশ্যঅনুসরণীয়। এরপর রুয়ানী লেখেন- والأول أظهر عندي অর্থাৎ প্রথম সিদ্ধান্তই আমার কাছে অধিক 'জাহির' (স্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ)। (বাহরুল মাযহাব, আবুল মাহাসিন রুয়ানী ৪/২৭১, দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত)

আবুল মাহাসিন রুয়ানীর শেষজীবনের এ কিতাবের বর্ণনার আলোকে 'তরহুত তাছরীব' অলিউদ্দীন ইরাকীর* মুদ্রিত নুসখায় (৪/১১২) রুয়ানীর বরাতে যে বিবরণ আছে তা সংশোধন করে নেওয়া উচিত।

[টীকা : * আহকামের হাদীসের উপর যায়নুদ্দীন ইরাকীর অতি উত্তম কিতাব 'তাকরীবুল আসানীদ ওয়া তারতীবুল মাসানীদ'। এরই শরহ-ভাষ্যগ্রন্থ হচ্ছে 'তরহুত তাছরীব'। এর রচনা তিনি নিজেই শুরু করেছিলেন কিন্তু সমাপ্ত করেছেন তাঁর পুত্র অলিউদ্দীন ইরাকী। কিতাবুস সিয়ামের এ পরিচ্ছেদগুলো অলিউদ্দীন ইরাকীকৃত তাকমিলারই অংশ।]

তাতে এ স্পষ্ট বৃত্তান্তের পর যে, শাফেয়ী মাযহাবের কতিপয় মনীষী উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য মনে করেন না এবং এ বৃত্তান্তেরও পর যে, শায়খ আবু হামেদ (আসফারাইনী), আবু ইসহাক শীরাজী, গাযালী, শাশী (আবু বকর ফখরুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ৪২৯ হি-৫০৭ হি., হিলয়াতুল উলামার লেখক) ও অধিকাংশের নিকট 'আসাহ' অধিকতর সহীহ এই যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক জায়গার চাঁদ দেখার কারণে অন্য জায়গায় রোযা জরুরি হবে না-এই দুই স্পষ্ট বিবরণের পর তরহুত তাছরীবের মুদ্রিত নুসখায় লেখা আছে-

والثاني : الوجوب، وإليه ذهب القاضي أبو الطيب، والروياني، وقال : إنه ظاهر المذهب، واختاره جميع أصحابنا.

অর্থাৎ দ্বিতীয় 'ওয়াজহ' এই যে, (দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক জায়গার চাঁদ দেখার কারণে অন্য জায়গায়) রোযা ওয়াজিব হবে। কাযী আবুত তাইয়েব এদিকেই গিয়েছেন, রুয়ানীও। তিনি বলেছেন, এটি 'জাহিরুল মাযহাব।' এবং একে আমাদের সকল আসহাব (সকল শাফেয়ী ফকীহ) গ্রহণ করেছেন।-তরহুত তাছরীব ৪/১১২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৪২১ হিজরী)

আহমদ গুমারী এ বরাতের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে চিন্তা না করে এবং আগে-পরের স্পষ্ট কথাগুলোর দিকে লক্ষ্য না করে তার কিতাব ''তাওজীহুল আনযার''-এ তা নকল করে দিয়েছেন!!

চিন্তা করার বিষয় এই যে, যখন অধিকাংশ শাফেয়ী ফকীহ প্রথম

সিদ্ধান্তকে 'আসাহ' (অধিক বিশুদ্ধ/অগ্রগণ্য) বলছেন তখন দ্বিতীয় ওয়াজহের বিষয়ে واختاره جميع أصحابنا (আমাদের সকল ফকীহ তা গ্রহণ করেছেন) বলার কী অর্থ? এবং যখন ফিকহে শাফেয়ীর কিতাবসমূহে এ মাসআলায় শুধু শাফেয়ী ফকীহগণের মাসলাকই উল্লেখ করা হচ্ছে, সরাসরি ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর কোনো উক্তি/বক্তব্য কেউ উল্লেখই করছেন না, স্বয়ং রুয়ানীও উল্লেখ করেননি তাহলে একে 'জাহিরুল মাযহাব' বলা যায় কীভাবে?

পাঠক ইতিমধ্যে তার শেষ জীবনের কিতাব 'বাহরুল মাযহাবের' আলোচনা পাঠ করেছেন।**ওখানে তিনি পরিষ্কার বলছেন**-

والأول أظهر عندي

অর্থাৎ দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় না হওয়ার সিদ্ধান্তই আমার কাছে অধিক 'জাহির' (স্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ)।

রুয়ানীর রচনাবলির মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব 'হিলয়াতুল মুমিন'। জামেয়া উম্মুল কুরার একজন তালিবে ইলম এর এক অংশের তাহকীক (পান্ডুলিপি-সম্পাদনা) করেছেন। তাঁর সামনে এ কিতাবের দুটো হস্তলিখিত পান্ডুলিপি ছিল। দুটোতেই অনেক জায়াগায় কিছু কিছু বাক্য অস্পষ্ট।

'হিলয়াতুল মুমিন' সম্পর্কে ইবনুস সালাহ রাহ. (৬৪৩ হি.) বলেছেন, এ কিতাবে তিনি শাফেয়ী মাযহাবের বাইরের অনেক সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছেন (তাহযীবুল আসমা, নববী ১/৭৮৩)। এবং কাযী আবু শুহবা (৭৭৯-৮৫১ হি.) 'তবাকাতুশ শাফেয়িয়্যাহ'য় বলেছেন, এতে মাযহাবের বাইরে তাঁর নিজের অনেক ''ইখতিয়ারাত'' বা ব্যক্তিগত মত আছে, যার অনেক কিছুই মালেক রাহ.-এর মাযহাবের মুয়াফিক। (শাযারাতুয যাহাব, ইবনুল ইমাদ ৪/৪, ৫০২ হি.)

হিলয়াতুল মুমিনের যে অংশ ঐ তালিবে ইলম তাহকীক করেছেন তাতে লেখা আছে-

ولو أن أهل بلد رأوا الهلال يلزم على جميع أهل البلاد الصوم في ذلك اليوم في ظاهر المذهب وهو اختيار جماعة من أصحابنا، وبه قال أحمد، ... وهو اختيار القاضي الطبري.

অর্থ, যদি কোনো শহরবাসী চাঁদ দেখে তাহলে অন্য সকল শহরের অধিবাসীদের উপর ঐ দিন রোযা রাখা জরুরি হবে, জাহের মাযহাব অনুযায়ী।

এটিই আমাদের আসহাবের (ফকীহদের) এক জামাতের গৃহীত সিদ্ধান্ত। আর আহমদ রাহ. এমনটি বলেছেন ... এবং কাযী তবারীর গৃহীত মাসলাকও তা। (হিলয়াতুল মুমিন, আবুল মাহাসিন রুয়ানী, তাহকীক, তালিবে ইলম মুহাম্মাদ ইবনে মাতার ইবনে আলী আলমালেকী, জামেয়া উম্মুল কুরা ১৪২৮ হি.)

''হিলয়াতুল মুমিনে'র এ উদ্ধৃতি 'তরহুত তাছরীবে'র সূত্র হতে পারে। তবে اختيار جماعة من أصحابنا (আমাদের ফকীহগণের মধ্যে এক জামাতের গৃহীত মাসলাক) বিকৃত হয়ে اختاره جميع أصحابنا (আমাদের সকল আসহাব তথা ফকীহগণের গৃহীত মাসলাক)-এ পরিণত হয়েছে।

এখন থাকল একে 'জাহিরুল মাযহাব' বলা, যদি 'জাহিরুল মাযহাব' শব্দবন্ধের বিষয়ে রুয়ানীর বা শাফেয়ী লেখকগণের নিজস্ব কোনো পরিভাষা* না থাকে তাহলে প্রবল সম্ভাবনা এই যে, ওখানে বাক্যের কিছু অংশ বাদ পড়ে গেছে। প্রাচীন ও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখিত পান্ডুলিপি খুঁজলে প্রকৃত বিষয়টি বোঝা যাবে। আমার ধারণা, এখানে বাক্যটি এরকম হয়ে থাকবে-

في ظاهر مذهب مالك، وهو اختيار جماعة من أصحابنا

অর্থাৎ (উপরোক্ত সিদ্ধান্ত) মালেক রাহ.-এর মাযহাবের জাহির অনুযায়ী। আর তা আমাদের এক জামাত আসহাবের (ফকীহের) গৃহীত মাসলাক।

ফিকহের কিতাবের সাথে অন্তরঙ্গতা রাখা তালিবে ইলমগণ চিন্তা করলে দেখবেন في ظاهر المذهب (ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর মাযহাবের জাহের রেওয়ায়েত) বলার পর (وهو اختيار جماعة من أصحابنا) বাক্যটি অসংলগ্ন মনে হয়। এ বাক্য তখনই সংলগ্ন হতে পারে যখন ইতিপূর্বে অন্য কোনো ইমাম বা ফকীহের মাযহাব বর্ণনা করা হবে। অন্যথায় যে মাসলাক ইমাম শাফেয়ীর জাহির রেওয়ায়েত তা তো ঐ মাযহাবের একদল ফকীহর নয়, অধিকাংশ ফকীহর মাসলাক হবে। আর তা হবে 'ইত্তিবা'র (অনুসরণের) ভিত্তিতেও ইখতিয়ারে'র (পছন্দ ও গ্রহণের) ভিত্তিতে নয়। এটাই সাধারণ নিয়মের কথা।

যাহোক, এ বিষয়ে চূড়ান্ত ও নিশ্চিত কথা তো 'হিলয়াতুল মুমিনে'র প্রাচীন পান্ডুলিপিসমূহ এবং এর লেখকের পরিভাষাসমূহের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের পর এবং এ যুগের গবেষক শাফেয়ী আলিমগণের শরণাপন্ন হওয়ার পরই বলা যেতে পারে। আফসোস, এ মুহূর্তে আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ তাআলা হয়তো এর সুযোগ করে দিবেন। আমীন।

কিন্তু যদি ধরেও নেওয়া হয় যেও হিলয়াতুল মুমিনে' রুয়ানীর এ বাক্য এভাবেই আছে এবং এর সাধারণ অর্থই উদ্দেশ্য তাহলে বলাই বাহুল্য যে, এটি একটি অবাস্তব কথা, যা তাঁর শেষ জীবনে লেখা ''বাহরুল মাযহাবে''র বিবরণেরও পরিপন্থী। এতে তিনি দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় না হওয়াকেই 'আযহার' বলেছেন। আর তাঁর আগের-পরের অধিকাংশ শাফেয়ী ফকীহর বক্তব্যও তা-ই। وبالله التوفيق

* টীকা :

যেমন এ পরিভাষা হতে পারে যে, মাযহাবের কোনো ফকীহর (আসহাবুত তারজীহ স্তরের) দৃষ্টিতে যে সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ বা অগ্রগণ্য মনে হবে তিনি তাকে ظاهر المذهب বা المذهب শব্দে ব্যক্ত করেন। যদিও তা ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর কোনো 'মানসূস আলাইহি' স্পষ্ট বক্তব্য না হয়; বরং তাঁর মাযহাবের কোনো ফকীহর ইস্তিমবাত হয়।

কিংবা এ পরিভাষাও হতে পারে যে, মাযহাবের কোনো ফকীহ (মুজতাহিদ ফিল মাসাইল স্তরের, বা শাফেয়ীগণের পরিভাষা অনুযায়ী 'আসহাবুল উজূহ' স্তরের) যে সিদ্ধান্ত ইমাম শাফেয়ী রাহ. থেকে বর্ণিত কোনো মাসআলার ভিত্তিতে ইসতিখরাজ করেছেন এবং তা তাঁর দৃষ্টিতে শাফেয়ী মাযহাবের সিদ্ধান্ত হওয়ার দাবি রাখে, একে তিনি 'জাহিরুল মাযহাব' বলবেন।

কোনো লেখকের গ্রন্থে এ ধরনের কোনো পরিভাষার অনুসরণ বিচিত্র নয়। তবে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া নিশ্চিতভাবে কিছু বলা গবেষণার নীতির পরিপন্থী এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে না-জায়েয।

মালেকী মাযহাব

ইবনুল কাসিম রাহ. ও ইবনে ওয়াহব রাহ. ইমাম মালেক রাহ. থেকে বর্ণনা করেন-

.إن أهل البصرة إذا رأوا هلال رمضان، ثم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة والمدينة واليمن أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء

অর্থ, বসরার লোকেরা রমযানের চাঁদ দেখল, এরপর এর সংবাদ কুফা, মদীনা ও ইয়ামানবাসীদের নিকট পৌঁছল তাহলে তাদের রোযা রাখা জরুরি হবে। আর সময় অতিবাহিত হয়ে থাকলে কাযা করা জরুরি হবে।

এ বর্ণনা মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবদুস ''আলমাজমুআ''য় উল্লেখ করেছেন। ইনি ইমাম সুহনূনের অন্যতম বড় শাগরিদ। আর সুহনূন রাহ. হলেন ইবনুল কাসিম ও ইবনে ওয়াহবের শাগরিদ। আর এঁরা দুজন ইমাম মালিক রাহ.-এর মিসরী শাগরিদ।

''কিতাবুল মাজমূআ'' থেকে এ রেওয়ায়েত মুফাসসির আবু আবদুল্লাহ কুরতুবী (৬৭১ হি.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 'আলজামি লিআহকামিল কুরআনে (৩/১৫৯) নকল করেছেন। আরো দেখুন : আননাওয়াদির ওয়ায যিয়াদাত, আবদুল্লাহ ইবনে আবু যায়েদ আলকাইরাওয়ানী (৩৮৬ হি.) খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১; আলমুনতাকা শরহুল মুয়াত্তা, আবুল ওয়ালীদ আলবাজী (৪৯৪ হি.) খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৩০।

উল্লেখ্য, বসরা থেকে কুফার দূরত্ব ৩৬৭ কি.মি.। আর মদীনার দূরত্ব ১০৫০ কি.মি., ইয়ামানের দূরত্ব ১৭১৭ কি.মি. (আনুমানিক)।

এতো ছিল ইমাম মালেক রাহ.-এর মিসরী শাগরিদদ্বয়ের বর্ণনা। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক রাহ.-এর মাদানী শাগরিদ আবদুল মালিক ইবনুল মাজিশূন (২১২ হি.)-এর বর্ণনা কিছুটা আলাদা। তিনি বলেছেন-

إن كان ثبت بالبصرة بأمر شائع ذائع يستغني عن الشهادة والتعديل له، فإنه يلزم غيرهم من أهل البلاد القضاء، وإن كان إنما ثبت عند حاكمهم بشهادة شاهدين، لم يلزم ذلك من البلاد إلا من كان يلزمه حكمُ ذلك الحاكم ممن هو في ولايته، أو يكون ثبت .ذلك عند أمير المؤمنين، فيلزم القضاءُ جماعةَ المسلمين. قال : وهذا قول مالك

বসরায় চাঁদ দেখা যদি এমন ব্যাপকভাবে প্রমাণিত হয়ে থাকে যে, সাক্ষ্য ও সাক্ষীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনই হয়নি তাহলে অন্য শহরের অধিবাসীদের ছুটে যাওয়া রোযার কাযা করতে হবে (অথবা অর্থ, অন্য শহরের অধিবাসীদের জন্য বসরার কাযীর ফয়সালাই অবশ্যঅনুসরণীয় হবে) আর যদি বসরার শাসকের কাছে দুই সাক্ষীর সাক্ষ্যের দ্বারা চাঁদ প্রমাণিত হয় তাহলে তা শুধু ঐ কাযীর কর্তৃত্বের এলাকায় অবশ্যঅনুসরণীয় হবে, অন্য শহরে নয়। তবে হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীনের কাছে চাঁদ প্রমাণিত হলে তাঁর ফয়সালা সকল মুসলিমের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় হবে।

তিনি (ইবনুল মাজিশূন রাহ.) বলেন, এটা মালিক রাহ.-এর সিদ্ধান্ত। ইবনুল মাজিশূন রাহ.-এর এ বর্ণনা ইমাম আবু ইসহাক ইসমাইল ইবনে ইসহাক আলবাগদাদী আলমালেকী রাহ. (২০০-২৮২ হি.)-এর বরাতে মুফাসসির কুরতুবী ''আলজামি লিআহকামিল কুরআনে'' (৩/১৫৯) এবং ইমাম আবুল ওয়ালীদ বাজী রাহ. ''আলমুনতাকা''য় (২/৪৩০-৪৩১) নকল করেছেন।

এবং একে আরো স্পষ্ট ভাষায় ইমাম ইবনে আবী যায়েদ আলকাইরাওয়ানী (৩৮৬ হি.) ''আননাওয়াদির ওয়ায যিয়াদাত'' গ্রন্থে (২/১১) ইবনে হাবীব (আবদুল মালিক ইবনে হাবীব,ওআলওয়াজিহা' লেখক ও ইবনুল মাজিশূন এর শাগরিদ)-এর বরাতে নকল করেছেন। ওখানে শেষ বাক্যটি এই - (وهذا قول مالك وأصحابه)

অর্থাৎ এটি মালিক রাহ. ও তাঁর শাগরিদগণের সিদ্ধান্ত।

ইমাম মালেক রাহ.-এর ঐ শাগরিদদের মাঝে মুগীরা ইবনে আবদুর রহমান (১২৪-১৮৮ হি.) ও মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে দীনার (১৮২ হি.) বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আবদুল বার রাহ. ''আলইসতিযকারে'' (১০/২৯) ইবনুল মাজিশূনের সাথে তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন।

(وهو قول المغيرة وابن دينار وابن الماجشون)

পরবর্তীতে মালেকী মাযহাবের কিতাবসমূহে সাধারণভাবে ইবনুল কাসিমের বর্ণনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এটিই তাঁদের প্রসিদ্ধ মাযহাব। কিন্তু চিন্তা করার বিষয় এই যে, ইবনুল কাসিম ও ইবনুল মাজিশূন উভয়ের বর্ণনায় মাসআলার প্রেক্ষাপট এই ধরা হয়েছে যে, বসরায় চাঁদের সিদ্ধান্ত হয়েছে আর এর সংবাদ কুফা, মদীনা ও ইয়েমেনে পৌঁছেছে।

এ প্রেক্ষাপট বর্ণনায় তাঁর উদ্দেশ্য কি শুধু একটি উদাহরণ দেওয়া, না এ কথা জানানো যে, এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকায় অবশ্যঅনুসরণীয় তখনই হবে যখন এদের পরস্পরের দূরত্ব অনেক বেশি না হবে; বরং কাছাকাছি হবে বা দূরের হলেও খুব বেশি দূরের না হবে।

মালেকী মাযহাবের অনেক লেখক বিষয়টি পরিষ্কার না করলেও কোনো কোনো গবেষক ফকীহ একথা স্পষ্ট বলেছেন যে, ইমাম মালিক রাহ.-এর বক্তব্যে যে শহরগুলোর কথা এসেছে এ দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, পরস্পর দূরত্ব খুব বেশি হলে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় হবে না।

যে লেখকগণ একে সর্বাবস্থার বিধান হিসেবে বর্ণনা করেছেন তাঁদের একজনের বরাত নকল করছি।

আবুয যিয়া খলীল ইবনে ইসহাক (৭৬৭ হি.)-এর ''মুখতাসারু খলীল'' ফিকহে মালেকীর এক প্রসিদ্ধ মতন। এর অনেক শরহ-হাওয়াশী (ভাষ্য ও টীকা) রচিত হয়েছে। এক শরহ আল্লামা আবুল বারাকাত আহমদ ইবনে আহমদ দরদের মালেকী (১১২৭-১২০১ হি.)-এর রচিত, যা 'আশশারহুল কাবীর' নামে প্রসিদ্ধ। এই শরহের উপর আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ দুসূকী (১২৩০ হি.)-এর হাশিয়া (টীকা) আছে এবং দুটো একসাথে মুদ্রিত।

দরদের লেখেন-

(وعَمَّ) الصومُ سائر البلاد قريبا أو بعيدا، ولا يراعى في ذلك مسافة قصر، ولا اتفاق المطالع ولا عدمها، فيجب الصوم على كل منقول إليه (إن نقل) ثبوته (بهما) أي بالعدلين أو المستفيضة (عنهما) أي عن العدلين، أو عن المستفيضة.

فالصور أربع : استفاضة عن مثلها، أو عن عدلين، وعدلان عن مثلهما، أو عن استفاضة.

ولا بد في شهادة النقل عن الشاهدين أن ينقل عن كل واحد اثنان، فيكفي نقل اثنين عن واحد، ثم عن الآخر، ولا يكفي نقل واحد عن واحد ... وأما النقل عن الحكم بثبوت الهلال برؤية العدلين، فإنه يعم ولو نقل الثبوت عند الحاكم واحد على الراجح.

দরদের রাহ.-এর এ বর্ণনার সারকথা এই যে, এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্যও অবশ্যঅনুসরণীয়। যদিও এ দুই জায়গার মাঝে কসরের দূরত্ব বা তার চেয়েও বেশি দূরত্ব হয় এবং যদিও দুই জায়গার উদয়স্থল আলাদা হয়। তবে শর্ত এই যে, শরীয়তমতে চাঁদ প্রমাণিত হতে হবে। এরপর তিনি চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন এবং এও বলেছেন যে, কোনো শহরের কাযীর চাঁদের ফয়সালা একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিও যদি অন্য শহরে পৌঁছে দেয় তাহলে তাঁর দৃষ্টিতে অগ্রগণ্য মত অনুসারে এ ফয়সালার উপর আমল করা জরুরি হবে। (আশশরহুল কাবীর ১/৫১০-৫১১, দারুল ফিকর, বৈরুত)

''আশশরহুল কাবীর'' এ মুহূর্তে আমার সামনে নেই। আমি এ উদ্ধৃতি উস্তাযে মুহতারাম হযরত শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ তকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর প্রবন্ধ رؤية الهلال : قبول الشهادة برؤية الهلال وموانعها থেকে নকল করেছি। প্রবন্ধটি بحوث في قضايا فقهية معاصرة -এর দ্বিতীয় সংস্করণের, যা দারুল কলম দামেশক কর্তৃক ১৪৩২ হিজরী, ২০১১ ঈসায়ী প্রকাশিত, দ্বিতীয় খন্ডে আছে।

পরবর্তী (মুতাআখখিরীন) মালেকী ফকীহগণের বিপরীতে এ মাযহাবের একাধিক গবেষক ফকীহ, ইলমে হাদীস ও ইলমে তাফসীরে যাঁদের অনেক উঁচু মাকাম রয়েছে, স্পষ্ট বলেছেন, যে সকল অঞ্চল পরস্পর অনেক বেশি দূরবর্তী সেগুলোতে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় নয়। যেমন -

1. ইমাম আবু উমার ইবনে আবদিল বার মালেকী রাহ. (৪৬৩ হি.) ''আলইসতিযকার'' গ্রন্থে ইমাম মালেক রাহ.-এর মিসরী শাগরিদ ও মাদানী শাগরিদগণের বর্ণনা ও অন্যান্য ফকীহগণের মাযহাব বর্ণনার পর লেখেন-

2. وأجمعوا أنه لا تُراعى الرؤية فيما أخر من البلدان كالاندلس من خراسان.

অর্থাৎ তাঁরা সবাই এ বিষয়ে একমত যে, যে সকল শহর পরস্পর অনেক বেশি দূরে অবস্থিত যেমন আন্দালুস থেকে খোরাসান, সেখানে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গায় প্রযোজ্য হবে না। (আলইসতিযকার শরহুল মুয়াত্তা ১০/৩০)

ইবনে আবদুল বার রাহ. আন্দালুসের কুরতুবা (কর্ডোবা) নগরীর অধিবাসী ছিলেন। কুরতুবা থেকে (উত্তর) খোরাসান (আনুমানিক) ৫৩০৩) কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

3. আবু বকর ইবনুল আরাবী

এমনিভাবে কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী মালেকী (মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ৪৬৮-৫৪৩ হি.) তাঁর কিতাব ''আরিযাতুল আহওয়াযী'' (৩/২১০-২১১)-এর আলোচনার বিপরীতে তার অন্য কিতাব ''আহকামুল কুরআনে'' লেখেন-

إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد فلا يخلو أن يقرب أو يبعد، فإن قرب فالحكم واحد، وإن بعد فقد قال قوم : لأهل كل بلد رؤيتهم. وقيل يلزمهم ذلك ...

واختلف في تأويل قول ابن عباس هذا، فقيل : رده لأنه خبر واحد، وقيل : رده، لأن الأقطار مختلفة في المطالع، وهو الصحيح، لأن كريبا لم يشهد، وإنما أخبر عن حكم ثبت بشهادة، ولا خلاف في أن الحكم الثابت بالشهادة يجزئ فيه خبر الواحد.

... ونظيره ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة بأَغْمَات، وأهل بإشبيلية ليلة السبت، فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم

অর্থ, কেউ যদি অন্য কোনো শহরে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সংবাদ দেয় তাহলে হয়তো সে শহর কাছে হবে অথবা দূরে। যদি কাছে হয় তাহলে দুই শহরের বিধান একই। আর দূরে হলে এক দল (ফকীহগণের এক জামাত) বলেন, প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য। আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, তাদের জন্যও (সে চাঁদ দেখা) অবশ্যঅনুসরণীয়। (এরপর ইবনে আরাবী রাহ. আদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর ঐ হাদীস উল্লেখ করে বলেন) ইবনে আববাস রা.-এর এ বক্তব্যের ব্যাখ্যায় ইখতিলাফ আছে : কেউ বলেছেন, তিনি এর (শামে চাঁদ দেখার) ইতিবার এজন্য করেননি যে, বর্ণনাকারী ছিলেন একজন। আর কেউ বলেছেন, ইতিবার না করার কারণ দুই এলাকার উদয়স্থল আলাদা হওয়া। এটিই সঠিক কথা। কারণ কুরাইব তো ফয়সালার সংবাদ দিয়েছিলেন। আর এতে কোনো দ্বিমত নেই যে, কাযীর ফয়সালা নকল করার ক্ষেত্রে একজনের সংবাদও গ্রহণযোগ্য।(**তাই ইতিবার না করার কারণ সংবাদদাতা একজন হওয়া নয়**, উদয়স্থল আলাদা হওয়া।)

এর দৃষ্টান্ত এমন যে, যদি 'আগমাত'-এ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে চাঁদ দেখা যায় আর ইশবীলিয়্যায় শুক্রবার দিবাগত রাতে, তাহলে এক্ষেত্রে প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের নিজেদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য হবে।-আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী ১/৮৪-৮৫

আর আগমাত থেকে ইশবিলিয়্যার দূরত্ব ৬৮১ কি.মি (আনুমানিক)

4. ইবনে রুশদ আলহাফীদ

ইমাম আবুল ওয়ালীদ ইবনে রুশদ (৫২০-৫৯৫ হি.)ও "বিদায়াতুল মুজতাহিদ" গ্রন্থে ইমাম মালিক রাহ.-এর মিসরী শাগরিদ ও মাদানী শাগরিদদের বর্ণনা উল্লেখ করার পর লেখেন-

وأجمعوا أنه لا يُراعى ذلك في البلدان النائية، كالأندلس والحجاز.

এবং সবাই এ বিষয়ে একমত যে, অনেক দূরের শহরসমূহে যেমন আন্দালুস ও হিজাযে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলে ধর্তব্য হবে না। (বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/৩৫৮, দারুল আকীদা, কাহেরা)

(আন্দালুস থেকে মদীনা ৪৪৪৪ কি.মি. আনুমানিক)

5. আবুল আববাস কুরতুবী

ফিকহ ও হাদীসের ইমাম আল্লামা আবুল আববাস আহমদ ইবনে উমার আলকুরতুবী (৫৭৮-৬৫৬ হি.) সহীহ মুসলিমের সংক্ষেপণ করেছেন। এরপর 'আলমুফহিম" নামে নিজেই এর শরহ (ভাষ্য) লিখেছেন। এতে 'কিতাবুস সওম-এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম এই-

... باب لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد

অর্থাৎ, দূরে দূরে হলে প্রত্যেক শহরের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য।

এ পরিচ্ছেদের ভাষ্যে তিনি লিখেছেন-অর্থ, আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর এ বাণী-

هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এরূপ আদেশ করেছেন) মারফূ হাদীস হওয়া স্পষ্ট। সুতরাং এ হাদীস দলিল যে, যেসব শহর শাম ও হিজাযের মতো দূরে দূরে অবস্থিত সেখানে প্রত্যেককে নিজ নিজ চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করা চাই, যদিও কোনো জায়গার চাঁদ দেখা আমীরুল মুমিনীনের কাছেও প্রমাণিত হয়। হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীনের কাছে চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি যদি ব্যাপকভাবে এর ফয়সালা করেন এবং সবাইকে সে অনুসারে আমলের হুকুম করেন তাহলে প্রত্যেককে এই চাঁদ দেখার উপরই আমল করতে হবে। আমীরের বিরোধিতা করা বৈধ হবে না। কারণ এ মাসআলা ইজতিহাদী ও ইখতিলাফী। আর আমীরুল মুমিনীনের ফয়সালার পর বিপরীত ইজতিহাদের কার্যকারিতা থাকে না। সুতরাং তাঁর বিরোধিতা অবৈধ হবে। তাঁর ভাষায়-

... فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره، وإن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم، ما لم يحمل الناس على ذلك فلا تجوز مخالفته، إذ المسألة اجتهادية مختلف فيها، ولا يبقى مع حكم الإمام اجتهاد، ولا تحل مخالفته.

আবুল আববাস কুরতুবী রাহ. তাঁর আলোচনায় সামনে গিয়ে বলেন-

وحكى أبو عمر ابن عبد البر الإجماع على أنه لا تُراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالأندلس من خراسان، قال : ولكل بلد رؤيتهم، إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين.

قلت : وهذا الإجماع الذي حكاه أبو عمر يدل على أن الخلاف الواقع في هذه المسألة إنما هو فيما تقارب من البلاد، ولم يكن في حكم القطر الواحد.

এই উদ্ধৃতির সারকথা হচ্ছে, ইবনে আবদুল বার রাহ. এ বিষয়ে ইজমা নকল করেছেন যে, অনেক বেশি দূরের শহর-নগরে, যেমন আন্দালুস থেকে খোরাসান, এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গায় ধর্তব্য হবে না। এই ইজমা থেকে জানা গেল যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা প্রসঙ্গে যে ইখতিলাফ তা এমন শহর-নগরের ক্ষেত্রে, যা একে অপর থেকে অনেক বেশি দূরে নয়, যে কারণে কুতরই (প্রান্ত) আলাদা হয়ে যায়।

এরপর মালেকী মাশায়েখের বক্তব্য যে, নিকট-দূর সকল ক্ষেত্রে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য ধর্তব্য এর উপর পর্যালোচনা করে আবুল আববাস কুরতুবী রাহ. বলেন, মাশায়েখদের এ কথাকে ইবনে আবদুল বার রাহ.-এর নকলকৃত ইজমার আলোকে বুঝতে হবে। তিনি লেখেন-

هكذا وقع نقل المشايخ لهذه المسألة، ولم يفرقوا بين البعيد والقريب من الأقاليم، والصواب الفرق، بدليل الإجماع الذي حكاه أبو عمر، فيحمل إطلاق المشايخ على البلاد المتقاربة، والله تعالى أعلم.

(আলমুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখীছি কিতাবি মুসলিম ৩/১৪২-১৪৪, দারু ইবনে কাছীর, দিমাশক ও বৈরুত)

আবুল আববাস কুরতুবীর শাগরিদ মুফাসসির আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ কুরতুবী (৬৭১ হি.) 'আলজামি লিআহকামিল কুরআন''-এ নিজ শায়খের বিভিন্ন কথা বর্ণনা করেছেন। ইবনুল আরাবী ও ইবনে আবদিল

বার এর বরাতও উল্লেখ করেছেন। আগ্রহী পাঠক তাঁর আলোচনা 'আলজামি লিআহকামিল কুরআন (৩/১৫৭-১৫৯, সূরাতুল বাকারার আয়াত : ১৮৫-এর অধীনে) দেখতে পারেন।

তদ্রূপ ইমাম শিহাবুদ্দীন আবুল আববাস আলকারাফী আহমদ ইবনে ইদরীছ আলমালেকী (৬২৬-৬৮৪ হি.) ''আযযখীরাহ'' (২/৪৯০) ও ''আলফুরূক'' গ্রন্থে দালীলিক আলোচনার পর লেখেন-

وهذا حق ظاهر، وصواب متعين، أما وجوب الصوم على جميع الأقاليم برؤية الهلال بقطر منها فبعيد عن القواعد، والأدلة لم تقتض ذلك، فاعلمه.

অর্থ৷এ (অর্থাৎ প্রত্যেক দিগন্তে নিজেদের চাঁদ দেখা প্রযোজ্য হওয়া) স্পষ্ট বিধান; বরং এ-ই নির্ধারিত। কোনো ভূখন্ডে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার দ্বারা সকল ভূখন্ডের অধিবাসীর উপর রোযা ফরয হওয়ার বক্তব্য (শরীয়তের) নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং শরীয়তের দলিলসমূহের দাবিও তা নয়। (আলফুরূক, কারাফী ২/৩০২ ফরক : ১০২)

তবে মনে রাখতে হবে, কারাফী উপরের কথাটি নিজের গবেষণা অনুসারে বলেছেন। একে মালেকী মাযহাবের সাথে সম্বন্ধ করেননি; বরং মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কওলের উপর আপত্তি আকারে পেশ করেছেন।

6. ইবনে জুযাই আলকালবী (৬৯৩-৭৪১ হি.)

ইমাম আবুল কাসেম মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ ইবনে জুযাই আলকালবী আলমালেকী ৭৪১ হিজরীতে যার শাহাদত, তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব ''আলকাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যাহ''য় লেখেন-

إذا رآه أهل بلد لزم الحكم غيرهم من أهل البلدان، وفاقا للشافعي، خلافا لابن الماجشون، ولا يلزم في البلاد البعيدة جدا، كالأندلس والحجاز إجماعا.

এখানে ইবনে জুযাই মালেকী রাহ. পরিষ্কার বলেছেন যে, অনেক দূরের শহর-নগরে যেমন আন্দালুস ও হিজায, এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় (লাযিম) না হওয়া ইজমায়ী বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। (আলকাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যাহ, পৃষ্ঠা : ৮৯, আলকিসমুল আওয়াল, কিতাবুস সিয়াম)

7. ইবনে আরাফা (৭১৬-৮০৩ হি.)

অষ্টম হিজরী শতকে মালেকী মাযহাবের অনেক বড় ব্যক্তিত্ব

আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আরাফাও ইবনে আবদিল বার রাহ.-এর বক্তব্য নকল করে এর সমর্থন করেছেন।

ইবনে আরাফার ''আলমুখতাসারুল কাবীর'' আমার কাছে নেই। আর তাঁর ''আলমাবসূত ফিল ফিকহ'' সম্ভবত এখনো পান্ডুলিপি আকারে আছে। তবে তাঁর বক্তব্য ''মাওয়াহিবুল জলীল'' হাত্তাব (৩/২৮৪)৷তাবয়ীনু উজূহিল ইখতিলাল ফী মুসতানাদি ইলানিল আদলিয়্যাতি বিছুবূতি রুয়াতিল হিলাল'', আবদুর রহমান ইবনে যায়দান (পৃষ্ঠা : ৭৪), এবং ''আলআযবুয যুলাল'' (১/২৭)-এ নকল করা হয়েছে।

৪. আবু আবদিল্লাহ আলহাত্তাব আলমালেকী (৯০২-৯৫৪ হি.)

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আবু আবদিল্লাহ আলহাত্তাব ''মুখতাসারু খলীলে''র প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত ভাষ্যকার। তিনি তার শরহে, ইবনে আরাফার সূত্রে আবু উমার ইবনে আবদুল বার রাহ.-এর কথা নকল করেছেন যে, অনেক দূরের এলাকায় এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য ধর্তব্য না হওয়া সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত। আর একে তিনি تنبيه শিরোনামে উল্লেখ করেছেন, যা বাংলায় অনেকটা 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' শিরোনামের সমার্থক।

تنبيه : قال ابن عرفة : قال أبو عمر : وأجمعوا على عدم لحوق حكم رؤيته ما بعد كالأندلس من خراسان.

(মাওয়াহিবুল জলীল শরহু মুখতাসারি খলীল, হাত্তাব মালেকী ৩/২৮৪)

এ বিষয়ে মালেকী ফকীহগণের আরো বরাত-উদ্ধৃতির জন্য আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব-এর কিতাব ''আলআযবুয যুলাল ফী মাবাহিছি রুয়াতিল হিলাল'' অধ্যয়ন করা যায়, যা কাতারে শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম আনসারী রাহ.-এর তত্ত্বাবধানে মোটা মোটা দুই ভলিউমে প্রকাশিত হয়েছে।

এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে আমার পক্ষে আরো বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই।

হাম্বলী মাযহাব

চার মাযহাবের মধ্যে এক হাম্বলী মাযহাবেরই প্রায় সকল ফকীহ উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় মনে করেন। দু চারজন আছেন, যারা এর বিপরীত মত পোষণ করেন।

স্বয়ং ইমাম আহমদ রাহ. থেকেই এ বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। ইমাম আহমদ রাহ. (২৪১ হি.)-এর শাগরিদ ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানী (২৭৫ হি.) যিনি ''আসুসনান''-এর সংকলক, ইমাম আহমদ রাহ.-এর কাছে যেসব ফিকহী মাসাইল সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন বা তাঁর উপস্থিতিতে অন্য কেউ করেছিলেন তা একটি আলাদা কিতাবে সংকলিত হয়েছে। ''মাসাইলু আহমদ'' নামে তা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আবু মুয়ায তারিক সম্পাদিত এডিশনটি এর উত্তম এডিশন। আমি সেখান থেকে এ মাসআলা নকল করছি।

سمعت أحمد، سئل عن حديث كريب، تذهب إليه؟ يعني حديث محمد بن أبي حرملة عن كريب، قدمت يعني من الشام، فسألني ابن عباس، قال : لا، يعني لا أذهب إليه. قال : إذا استبان لهم أنهم رأوه يعني قبل اليوم الذي صاموا قضى يعني ذلك اليوم، يعني هذا الحديث : حدثنا موسى بن إسماعيل ...

অর্থ, আবু দাউদ বলেন, আমি আহমদ রাহ.কে বলতে শুনেছি, তাঁকে কেউ প্রশ্ন করলেন, আপনার মাযহাব কি কুরাইবের হাদীসের অনুযায়ী? অর্থাৎ, ঐ হাদীস যাতে আছে যে, কুরাইব শাম থেকে মদীনায় এলেন তো আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন (তোমরা কবে চাঁদ দেখেছ? ঐ প্রসিদ্ধ হাদীস যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।) আহমদ রাহ. বললেন, না। অর্থাৎ আমার মাযহাব সে অনুযায়ী নয়। আহমদ রাহ. বললেন, যখন (এ এলাকার লোকদের) পরিষ্কার জানা হয়ে যাবে যে, (ঐ এলাকার লোকেরা) এক দিন আগে চাঁদ দেখেছে তখন

এদেরকে সেদিনের রোযা কাযা করতে হবে। (এরপর আবু দাউদ রাহ. এ হাদীসের পুরা মতন উল্লেখ করেন।) - মাসাইলু ইমাম আহমদ, আবু দাউদ সিজিস্তানী পৃষ্ঠা : ১২৮, বর্ণনা : ৬১৬

আবু দাউদ সিজিস্তানী রাহ.-এর এ উদ্ধৃতির দ্বারা একদিকে যেমন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.-এর মাযহাব জানা গেল যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রেও তিনি উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার কথা বলতেন এবং সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও যদি নিজেদের চাঁদের ভিত্তিতে রোযা আরম্ভকারীদের কাছে প্রমাণিত হয় যে, অমুক শহরে চাঁদ দেখার ভিত্তিতেই তাদের এক দিন আগে রোযা শুরু হয়েছে তাহলে তাদের ঐ দিনের রোযা কাযা করতে হবে।

তেমনি এ-ও জানা গেল যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর ঐ হাদীসের মূল কথা এটাই যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় নয়। আর এ কারণে এক শহরের অধিবাসীদের উপর অন্য শহরের অধিবাসীদের চাঁদ দেখার কারণে রোযার কাযা জরুরি হবে না।

ইমাম আহমদ রাহ.-এর সামনে এ হাদীস উল্লেখ করে যখন বলা হল-

تذهب إليه؟

আপনি কি তা গ্রহণ করেন? (আপনার মাযহাব কি এ অনুযায়ী?) তখন তিনি বললেন‚না।' এরপর নিজের মাযহাব বর্ণনা করলেন। তিনি এ কথা বলেননি যে, আমার মাযহাব এ হাদীসের বিপরীত নয়। আমার মাযহাব তো এই যে, শামের চাঁদ দেখা মদীনাবাসীর জন্যও প্রযোজ্য আর এ হাদীসেও তা বলা হয়েছে বা এর বিপরীত কিছু বলা হয়নি। বরং ইমাম আহমদ রাহ., ইমাম আবু দাউদ ও প্রশ্নকারী সকলেই বুঝছেন যে, এ হাদীস দ্বারা শামের চাঁদ দেখা মদীনাবাসীর জন্য (এবং এভাবে দূর-দূরান্তের শহর-নগরে এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য) ধর্তব্য না হওয়াই প্রমাণিত, তবে ইমাম আহমদ রাহ.-এর কাছে দলীলের বিচারে এর বিপরীত মাযহাব অগ্রগণ্য। তাই তিনি এ মাসলাক গ্রহণ করেননি।

যারা নির্দ্বিধায় বলে দেন কুরাইবের হাদীস উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার বিষয়ে দলীল হতে পারে না, তাদের জন্য এ ঘটনায় চিন্তার খোরাক রয়েছে।

যাহোক, এখন আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইমাম আহমদ রাহ.-এর মাযহাব, তো এ বিষয়ে-আলহামদুলিল্লাহ-সরাসরি ইমাম আহমদ রাহ.-এর বক্তব্যই পাওয়া গেল। ফিকহে হাম্বলীর কিতাবসমূহে এ মাসআলা এভাবেই লেখা আছে। এখানে এ মাযহাবের সবচেয়ে সুলভ ও প্রসিদ্ধ কিতাবের বরাত নকল করছি।

শায়খ ইবনে কুদামা (আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ আলমাকদিসী) হাম্বলী রাহ. (৫৪১-৬২০ হি.) ইমাম আহমদ রাহ.-এর শাগরিদদের শাগরিদ আবুল কাসেম উমার ইবনুল হুসাইন আলখিরাকী (৩৩৪ হি.)-এর সংকলিত ‘‘মুখতাসার’’ কিতাবের একটি উৎকৃষ্ট ও বিশদ ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন ‘‘আলমুগনী’’ নামে, যা মাশাআল্লাহ খুবই সমাদৃত। ইবনে কুদামা তাতে লিখেছেন-

وإذا رأى الهلال أهل بلد، لزم جميعَ البلاد الصوم. وهذا قول الليث، وبعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم : إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة، لزم أهلهما الصوم برؤية الهلال في أحدهما، وإن كان بينهما بعد .. كالعراق والحجاز والشام، فلكل أهل بلد رؤيتهم

অর্থ, কোনো শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখলে সকল শহরের অধিবাসীদের উপর রোযা অপরিহার্য হয়। এটি (আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.-এর সাথে) লাইছ রাহ. (১৭৫ হি.)-এরও 'কওল'। এবং আসহাবুশ শাফেয়ীর কারো কারোর। আর কেউ কেউ বলেছেন, যদি দুই শহরের মাঝে দূরত্ব কম হয়, যার কারণে এদের উদয়স্থল অভিন্ন থাকে, যেমন বসরা ও বাগদাদ তো এদের কোনো শহরে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার দ্বারা উভয় শহরের অধিবাসীদের রোযা রাখা জরুরি হবে। পক্ষান্তরে দুই শহরের মাঝে দূরত্ব বেশি হলে যেমন, ইরাক, হিজায ও শাম, প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য হবে। (আলমুগনী, ইবনে কুদামা হাম্বলী রাহ. ৪/৩২৮, দারু আলামিল কুতুব, রিয়ায)

(বসরা থেকে বাগদাদের দূরত্ব ৪৪৮ কি.মি.।)

ইবনে কুদামা হাম্বলী রাহ. ফিকহে হাম্বলীতে একটি 'মতন'ও লিখেছেন। এর নাম ''আলমুকনি''। এর উপর হিজরী নবম শতাব্দীর গবেষক হাম্বলী ফকীহ শায়খুল ইসলাম আলাউদ্দীন আলী ইবনে সুলায়মান আলমারদাভী (৮১৭-৮৮৫ হি.) এক অসামান্য ভাষ্যগ্রন্থ প্রস্তুত করেছেন, যার খুবই যথার্থ নাম রাখা হয়েছে-

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

এ কিতাবে মারদাভী রাহ. লেখেন-

''যাঁরা চাঁদ দেখেছেন তাদের উপর রোযা ফরয হওয়ার বিষয়ে তো কোনো ইখতিলাফ নেই, তবে যে অঞ্চলের লোকেরা দেখেনি-যদি উভয় অঞ্চলের উদয়স্থল এক হয় তাহলে তাদেরকেও রোযা রাখতে হবে। আর উদয়স্থল আলাদা হলেও (হাম্বলী) মাযহাবের সহীহ কওল এই যে, রোযা জরুরি হবে। 'আলফুরূ'ও'আলফাইক' ও 'আররিয়ায়াহ' গ্রন্থে এ কওলই আগে লেখা হয়েছে (এ কওলকেই অগ্রগণ্য করা হয়েছে) (তবে) এ কওল (হাম্বলী মাযহাবের) 'মুফরাদাত'-এর অন্তর্ভুক্ত ...।' (আলইনসাফ ৩/২৭৩)

'মুফরাদাত' শব্দটি 'মুফরাদ'-এর বহুবচন। এর অর্থ, হাম্বলী মাযহাবের ঐ সকল মাসআলা, যেগুলোতে এ মাযহাব অন্যান্য মাযহাব থেকে আলাদা হয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য প্রসিদ্ধ মাযহাবের বিপরীত সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। এ-ই এ পরিভাষার প্রসিদ্ধ অর্থ। এ অর্থে আলোচিত মাসআলাকে হাম্বলী মাযহাবের 'মুফরাদ' (সঙ্গীহীন) সিদ্ধান্ত বলা আপত্তিমুক্ত নয়। কারণ অন্যান্য মাযহাবেও এ সিদ্ধান্ত দানকারী ফকীহ রয়েছেন।

বিগত শতাব্দীর প্রসিদ্ধ হাম্বলী আলেম শায়েখ আবদুল্লাহ বিন হুমাইদ, যিনি রাবেতাতুল আলামিল ইসলামীর ফিকহী বোর্ডের অন্যতম রোকন, তার কিতাব تبيان الأدلة في إثبات الأهلة (পৃষ্ঠা : ৪০)-এ 'ইনসাফ'-লেখকের এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন-

أي أن الجمهور على خلافه

অর্থাৎ যেহেতু অন্য সকল মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ এ সিদ্ধান্তের বিরোধী সম্ভবত এজন্যই তিনি একে হাম্বলী মাযহাবের ‘মুফরাদ’ (সঙ্গীহীন) সিদ্ধান্ত বলেছেন।

আল্লামা মারদাভী রাহ. সামনে লেখেন-

وقال في الفروع : وقال شيخنا : يعني به الشيخ تقي الدين، تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، فإن اتفقت لزم الصوم، وإلا فلا.

وقال في الرعاية الكبرى : يلزم من لم يره حكم من رآه. ثم قال : قلت : بل هذا مع تقارب المطالع واتفاقها، دون مسافة القصر، لا فيما فوقها، مع اختلافها. انتهى

অর্থ, (ইমাম ইবনে মুফলিহ রাহ.) ‘‘আলফুরু’’ তে বলেছেন, আমাদের শায়খ অর্থাৎ শায়খ তকিউদ্দীন (ইবনে তাইমিয়া রাহ. ৭২৮ হি.) বলেছেন, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ একমত যে, উদয়স্থল আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। সুতরাং উদয়স্থল এক হলে এক জায়গায় চাঁদ দেখার কারণে অন্য জায়গায় রোযা জরুরি হবে। পক্ষান্তরে উদয়স্থল আলাদা হলে জরুরি হবে না।

এবং (ইমাম ইবনে হামদান রাহ. ৬৯৫ হি.) ‘‘আররিয়ায়াতুল কুবরা’’য় বলেন, যাঁরা চাঁদ দেখেনি তাদের উপর ঐ লোকদের হুকুম প্রযোজ্য হবে যারা চাঁদ দেখেছে।’ কিছুদূর গিয়ে বলেন,‘বরং এ বিধান ঐ ক্ষেত্রে যখন দুই অঞ্চলের উদয়স্থল অভিন্ন বা কাছাকাছি হয় এবং পরস্পরের দূরত্ব কসরের দূরত্বের চেয়ে কম হয় (পক্ষান্তরে দুই শহরের দূরত্ব) কসরের দূরত্বের চেয়ে বেশি হলে এবং উদয়স্থল আলাদা হলে একের বিধান অন্যের জন্য প্রযোজ্য হবে না। (আলইনসাফ ৩/২৭৩, তাহকীক : হামিদ ফাক্কী, দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর ফিকহী ‘ইখতিয়ারাত’-এর উপর আলাউদ্দীন আবুল হাসান আলবা’লী (৮০৩ হি.) আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা ‘‘আলআখবারুল ইলমিয়্যাহ মিনাল ইখতিয়ারাতিল ফিকহিয়্যাহ লিশাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ’’ নামে প্রকাশিত। এর পৃষ্ঠা ১৫৮তেও ইবনে মুফলিহের উদ্ধৃত বক্তব্য বিদ্যমান আছে। সেখানে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর মন্তব্যও আছে যে, এ মাসলাক, যা তিনি গ্রহণ করেছেন, শাফেয়ী মাযহাবের ‘‘আসাহ’’ (অধিক সহীহ) মাসলাক এবং হাম্বলী মাযহাবের একটি সিদ্ধান্ত।

وهو الأصح للشافعية، وقول في مذهب أحمد.

উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে জানা গেল, ইমাম আহমদ রাহ. থেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য আছে যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রেও তিনি এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় মনে করেন। তবে হাম্বলী মাযহাবের এক সিদ্ধান্ত এ-ও আছে যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য লাযিম নয়। ইমাম ইবনে হামদান হাম্বলী (৬০৩-৬৯৫ হি.) ও শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী (৬৬১-৭২৮ হি.) এ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন।

সারসংক্ষেপ

সাহাবা ও তাবেয়ীনের আছর এবং চার মাযহাবের উদ্ধৃতিতে এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ এই-

এক. সাহাবী-যুগে আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর মাযহাব এই ছিল যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলে ধর্তব্য হবে না। এর বিপরীত কোনো ফতোয়া কোনো সাহাবী থেকে পাওয়া যায়নি।

দুই. তাবেয়ীন-যুগে ইকরিমা রাহ., সালিম রাহ. ও কাসিম রাহ. থেকেও অনুরূপ ফতোয়া পাওয়া গেছে। এর বিপরীত সিদ্ধান্ত কোনো তাবেয়ী থেকে পাওয়া যায়নি। তবে হাসান বসরী রাহ.-এর একটি ফতোয়া বিপরীত সিদ্ধান্তের ধারক হতে পারে।

তিন. আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও ইসহাক ইবনে রাহূয়াহ রাহ.-এরও মাসলাক তাই ছিল, যা উপরের মনীষীদের ছিল।

চার. হানাফী মাযহাবের পূর্বসূরী ফকীহগণের অধিকাংশ আর পরবর্তীদেরও অনেক বড় বড় ফকীহর সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় নয়। মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা তিন ইমাম বা তাঁদের শাগরিদ বা শাগরিদদের শাগরিদ কারো থেকেই لا عبرة لاختلاف المطالع শীর্ষক কথা পাওয়া যায়নি-না জাহির রিওয়ায়েতে, না নাদির রেওয়ায়েতে। আমাদের জানামতে, এ বাক্য لا عبرة لاختلاف المطالع সবার আগে এসেছে 'খানিয়া' ও 'খুলাসা'য় আর উভয় কিতাবে একে 'জাহের রেওয়ায়েত' বলা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, এ দাবি বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ তা জাহির রেওয়ায়েতের কিতাবসমূহে পাওয়া যায়নি। সুতরাং বাস্তবে এখানে 'তাসামুহ' হয়েছে। একই সাথে উলামায়ে কেরাম ও তলাবায়ে নেকনেযামের কাছে দরখাস্ত করা হয়েছে যে, তাদের দৃষ্টিতে 'তাসামুহে'র দাবি ভুল হলে তাঁরা যেন জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ দান করেন।

পাঁচ. এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইবরাহীম হালাবী, ইবনে নুজাইম, তানভীরুল আবসারের লেখক, আলাউদ্দীন হাসকাফী, ও ইবনে আবেদীনসহ পরবর্তী যুগের অনেক ফকীহ لا عبرة لاختلاف المطالع কেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

ছয়. শাফেয়ী মাযহাবের উভয় 'তরীকা'র (ইরাকীগণের 'তরীকা' ও খুরাসানীগণের 'তরীকা') অধিকাংশ ফকীহ, যাঁদের মাঝে উভয় তরীকার প্রধানগণও রয়েছেন, এ সিদ্ধান্ত পোষণ করেন যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য 'লাযিম' (অবশ্যঅনুসরণীয়) নয়। তবে আবুল কাসিম সাইমারী ও কাযী আবুত তাইয়েবসহ কতিপয় মনীষী দূরের শহরেও তা অবশ্যঅনুসরণীয় মনে করেন।

সাত. ইমাম মালিক রাহ. থেকে এ সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে যে, বসরার চাঁদ দেখা কুফা, মদীনা ও ইয়ামানে পৌঁছলে সে অনুযায়ী আমল করা জরুরি। কোনো কোনো শাগরিদদের বর্ণনায় কোনো শর্ত ছাড়া আর ইবনুল মাজিশূনের বর্ণনায় একটি শর্ত সহকারে বর্ণিত হয়েছে।

আট. পরবর্তীতে ফিকহে মালেকীর অধিকাংশ লেখক এ বিধানকে দূরের-কাছের সকল শহরের জন্য প্রযোজ্য লিখেছেন এবং ঐ শর্তের পাবন্দীও জরুরি মনে করেননি।

নয়. তবে একাধিক গবেষক মালেকী ফকীহ স্পষ্ট বলেছেন যে, অনেক দূরের হলে, যেমন খোরাসান থেকে আন্দালুস বা আন্দালুস থেকে হিজায, এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (বিলইজমা) ধর্তব্য নয়।

দশ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. থেকে স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া গেছে যে, দূরের শহরেও যদি অন্য শহরের চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয় তাহলে তার ইতিবার করা জরুরি।

হাম্বলী মাযহাবের ফকীহদের মাসলাকও এটিই। তবে মাযহাবের একটি সিদ্ধান্ত এ-ও যে, উদয়স্থল আলাদা হলে দূরের এলাকাগুলোতে নিজেদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য হবে। ইবনে হামদান রাহ. ও ইবনে তাইমিয়া রাহ. এটিই গ্রহণ করেছেন।

(তবে মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়ায় (২৫/১০৩) উল্লেখিত ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়া এখানে উদ্ধৃত মাসলাক থেকে কিছুটা আলাদা। সামনে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা হতে পারে।)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কোনো তালিবে ইলমের যদি এ মাসআলা ''শরহুস সুন্নাহ'' বগভী থেকে (আবু মুহাম্মাদ আলহুসাইন ইবনে মাসউদ, লেখক : ''মাসাবীহুস সুন্নাহ'', জন্ম : ৪৩৬ হি., মৃত্যু : ৫১৬ হি.) পড়া থাকে আর তিনি উপরের আলোচনা ও উদ্ধৃতিগুলো মনোযোগের সাথে না পড়ে থাকেন তাহলে তার মনে একটি প্রশ্ন আসতে পারে। এজন্য ''শরহুস সুন্নাহ''র ইবারত নকল করে তার ব্যাখ্যা করে দেওয়া মুনাসিব মনে হচ্ছে।

শরহুস সুন্নাহয় লেখা আছে-

وإذا رئي الهلال ببلد، ورأى أهل بلد آخر بعده بليلة، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب كثير منهم إلى أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وإليه ذهب من التابعين القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعكرمة، وبه قال إسحاق بن راهوية ...

قال ابن المنذر : قال أكثر الفقهاء : إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم، فعليهم قضاء ما أفطروا، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي رحمهم الله.

অর্থ, কোনো শহরে চাঁদ দেখা গেল আর অন্য শহরের অধিবাসীরা পরের রাতে চাঁদ দেখল তো অনেক আহলে ইলমের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য। তাবেয়ীদের মধ্যে কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ, সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, ও ইকরিমার সিদ্ধান্ত তা-ই। ইসহাক ইবনে রাহূয়াহও একথা বলেছেন।

ইবনুল মুনযির বলেন, অধিকাংশ ফকীহ বলেছেন, যদি মানুষের সংবাদ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কোনো শহরের অধিবাসীরা তাদের আগে চাঁদ দেখেছে তাহলে তাদেরকে ছুটে যাওয়া রোযার কাযা করতে হবে। এটি মালিক, শাফেয়ী, আহমদ ও আসহাবরুর রায়ের সিদ্ধান্ত। রাহিমাহুমুল্লাহ।

(শরহুস সুন্নাহ বাগাভী ৪/১৪৫ باب الشهادة على رؤية الهلال)

এখানে বাগাভী রাহ. ইবনুল মুনযিরের বরাতে যা লিখেছেন তাতে ‘তাসামুহ’ হয়েছে। এখানে ইবনুল মুনযিরের (মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আননাইসাবূরী জন্ম : ২৪১ হি., মৃত্যু : ৩১৮ হি.) কিতাব ‘‘আলইশরাফ আলা মাযাহিবি আহলিল ইলম’’ থেকে আমরা তাঁর বক্তব্য সরাসরি নকল করছি-

باب الهلال يراه أهل بلدة دون سائر البلدان : قال اختلف أهل العلم في الهلال يراه أهل بلدة، ولا يراه غيرهم. فروينا عن عكرمة أنه قال : لكل قوم رؤيتهم. وبه قال إسحاق، وهو مذهب القاسم والسالم.

وقال آخرون : إذا ثبت ذلك عند الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا. هذا قول الليث بن سعد، والشافعي وأحمد، ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي.

অর্থ, পরিচ্ছেদ : কোনো শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখল, অন্য শহরের অধিবাসীরা দেখল না :

কোনো শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখল, আর অন্য শহরের অধিবাসীরা দেখল না এক্ষেত্রে আহলে ইলমের ইখতিলাফ আছে : ইকরিমা থেকে আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক কওমের (শহরের) জন্য নিজেদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য। ইসহাক রাহ.-এ-ই বলেছেন। আর এটাই কাসিম ও সালিমের মাযহাব।

অন্য কতেক আহলে ইলম বলেছেন, যদি লোকদের কাছে প্রমাণিত হয় কোনো শহরের অধিবাসীরা (তাদের আগে) চাঁদ দেখেছে তাহলে তাদেরকে ছুটে যাওয়া রোযা কাযা করতে হবে। এটা লাইছ ইবনে সাদ, শাফেয়ী ও আহমদ রাহ.-এর সিদ্ধান্ত।

আর আমার ধারণা, এটি মাদানী ও কুফীরও সিদ্ধান্ত। (আলইশরাফ, ইবনুল মুনযির ৩/১১২)

ইবনুল মুনযিরের বক্তব্যে وقال آخرون শব্দ আছে। وقال الآخرون শব্দ নয়। প্রথম শব্দের অর্থ তা-ই যা আমি তরজমায় লিখেছি (অন্য কতেক আহলে ইলম বলেছেন)। এর অর্থ ‘অন্যরা বলেন’ নয়, তেমনি ‘অন্য সবাই বলেন’ও নয়।

মনে হয় বগভী রাহ. ইবনুল মুনযিরের উদ্ধৃতি সরাসরি তাঁর কিতাব থেকে নকল করেননি। খাত্তাবী বা অন্য কারো সূত্রে নিয়েছেন। যাইহোক, মূল পাঠ সামনে না থাকায় وقال آخرون পরিবর্তন হয়ে قال أكثر الفقهاء (অধিকাংশ ফকীহ বলেছেন) এ পরিণত হয়েছে আর বক্তব্য এই দাঁড়িয়েছে, যা বাস্তবসম্মত থাকেনি।

এরপর ইবনুল মুনযির ‘মাদানী’ (ইমাম মালেক রাহ.) ও কুফী (ইমাম আবু হানীফা রাহ.)-এর মাযহাব সম্পর্কে প্রত্যয়ের সাথে কিছু বলেননি। তিনি বলেছেন, ولا أعلمه إلا অর্থাৎ আমার ধারণা, এ দুজনের সিদ্ধান্তও অনুরূপ। এখন ইমাম মালেক রাহ. সম্পর্কে তো এ ধারণা সঠিক পাওয়া গেছে, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা রাহ. সম্পর্কে সঠিক পাওয়া যায়নি। কারণ ইমাম আবু হানীফা রাহ. থেকে এ মাসআলা বর্ণিত হয়নি। নাদির রেওয়ায়েতে তাঁর দুই শাগরিদ আবু ইউসুফ রাহ. ও মুহাম্মাদ রাহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ এ-ই করেছেন যে, তা কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে নয়।

যাইহোক, এরপরও ইবনুল মুনযির কথাটি বলেছিলেন প্রত্যয় ছাড়া এবং শুধু আবু হানীফা সম্পর্কে, কিন্তু বগভীর বিবরণে ধারণার পরিবর্তে প্রত্যয়ের সাথে বলা হয়েছে আর শুধু আবু হানীফা সম্পর্কে নয়, সকল 'আসহাবুর রায়' (সব হানাফী ফকীহ) সম্পর্কে বলা হয়েছে। আসল বক্তব্য সামনে না থাকায় মূল ও বর্ণনায় এত বড় পার্থক্য হয়ে গেল।

লাইছ ইবনে সাদ সম্পর্কে ইবনে কুদামাও লিখেছেন যে, তাঁর কাছে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্যও অবশ্যঅনুসরণীয়। আমার কাছে তাঁর সম্পর্কে কোনো বিপরীত বর্ণনা নেই। ইমাম আহমদ রাহ.-এর কথা তো ইমাম আবু দাউদ-এর বরাতেই এসেছে। থাকল ইমাম শাফেয়ীর উদ্ধৃতি, তো এ বিষয়ে শাফেয়ী মাযহাবের ফিকহের কিতাবসমূহ ইবনুল মুনযিরের বর্ণনার অনুকূল দেখা যায় না। শাফেয়ী ফকীহগণ এ বিষয়ে শুধু আসহাবে শাফেয়ীর 'উজূহ' বর্ণনা করেছেন, ইমাম শাফেয়ীর কোনো 'কওল' বর্ণনা করেননি। আর ইলকিয়া তবারীর মতো বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী শাফেয়ী আলিমও 'আহকামুল কুরআনে' পরিষ্কার বলেছেন-

وأصحاب الشافعي لا يرونه

আসহাবে শাফেয়ী ত্রিশ ওয়ালাদের কারণে উনত্রিশ ওয়ালাদের উপর একদিনের রোযা কাযা করতে হবে বলে মনে করেন না। তাহলে এ কীভাবে সম্ভব যে, সকল আসহাবে শাফেয়ী চুপচাপ ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর কওলের বিপরীত ফতোয়া দেয়ার বিষয়ে একমত হয়ে যাবেন।*

এখানে এ কথাও জেনে রাখা ভালো যে, বগভী রাহ. শরহুস সুন্নাহয় যদিও ইবনুল মুনযিরের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যাতে ইমাম শাফেয়ী রাহ.কে ইমাম আহমদ রাহ.-এর সঙ্গে রাখা হয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর ফিকহে শাফেয়ীর গ্রন্থ 'আততাহযীব' এর মধ্যে এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ীর কোনো বক্তব্যই উল্লেখ করেননি।

না নিজ থেকে, না ইবনুল মুনযিরের বরাতে। বরং শাফেয়ী মাযহাবের অন্যান্য কিতাবের মতো শাফেয়ী ফকীহগণের দুটি 'ওয়াজহ'ই উল্লেখ করেছেন এবং দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মতটিকেই 'আছাহ' (أصح) বা সর্বাধিক সহীহ বলেছেন।

وإن كانتا متباعدتين بأن كان بينهما مسافة القصر، فهل يجب على أهل البلد الذين لم يروا الهلال الاقتداء بالذين رأوا، فيه وجهان ... والثاني وهو الأصح، لا يجب ...

আততাহযীব ফী ফিকহিল ইমামিশ শাফেয়ী, আবু মুহাম্মাদ আলবাগাভী রাহ. (৫১৬ হি.) দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৪১৮, ৩/১৪৭

* টীকা :

قال الراقم : ويحتمل أن يكون مأخذ ابن المنذر في عزوه إلى الإمام الشافعي ما جاء في كتاب الأم للشافعي ج ٢ ص ١٠٣ : وإن غم الشهران معا فصاموا ثلاثين فجاءتهم بينة بأن شعبان رئي قبل صومهم بيوم قضوا يوما، لأنهم تركوا يوما من رمضان ... . انتهى (ولعل لفظ شعبان هنا محرف عن رمضان،)

ولكن القرائن متضافرة في أن هذه المسألة مفروضة في البلاد المتقاربة التي يمكن فيها مجيء البينة في مثل تلك البيئة. والمقام يحتاج إلى بحث أكثر، وتدبر أدق، ونظر في كتب الشافعية أوسع، ومذاكرة مع علمائهم أشمل، انتهى قول الراقم.

যাইহোক, ইবনুল মুনযিরের বক্তব্যে শাফেয়ী রাহ.-এর সাথে যে সিদ্ধান্তের সম্বন্ধ করা হয়েছে তা বিভ্রান্তিকর। এদিকে নববীও ''আলমাজমূ শরহুল মুহাযযাবে'' ইষৎ ইঙ্গিত করেছেন। ''আলআযবুয যুলাল'' (১/৮৯) লেখক তা ধরতে পেরেছেন।

মোটকথা, দূর দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে অন্য জায়গার চাঁদ দেখা ধর্তব্য মনে করাকে অধিকাংশ ফকীহর মাসলাক বলে বর্ণনা করা ''শরহুস সুন্নাহ''র তাসামুহ। না ইবনুল মুনযির এমন বলেছেন, আর না তা বাস্তবসম্মত।

قال الراقم : واحتمال أن مأخذ البغوي كتاب آخر لابن المنذر غير الإشراف، بعيد، وإن كان كذلك فالاعتماد على عبارة الإشراف دون عبارة غيره لمخالفتها الواقع أشد مخالفة.

والشيء بالشيء يذكر، ذكر الوزير أبو المظفر ابن هُبَيْرَة في اختلاف الأئمة العلماء ج ١ ص ٢٣٢: واتفقوا على أنه إذا رئي الهلال في بلدة رؤية فاشية فإنه يجب الصوم على سائر أهل الدنيا ... . انتهى

قد صرح ابن هبيرة في مقدمة كتابه أنه يريد بمثل هذه العبارة اتفاق الأئمة الأربعة، فليس مراده اتفاق علماء الأمة مطلقا، ثم إن دعواه اتفاق الأربعة مبنية على عبارة الإشراف المبهمة والمبنية على التسامح، والإشراف من مصادر ابن هبيرة ينقل كلامه ويعزو إليه، فلا يغتر أحد بكلام ابن هبيرة هنا، فإنه بنى كلامه على كلام من تسامح ولم يدقق الأمر ولم يتقن النقل في هذه المسألة. والله الموفق.

هذا، وقد قال ابن هبيرة نفسُه في الإفصاح عن معاني الصحاح (ج ٣ ص ٢٣٢-٢٣٣، طبع دار الوطن الرياض) تحت حديث ابن عباس رضي الله عنهما المروي من طريق كُرَيب : في هذا الحديث ما يدل على أن لكل إقليم حكمه. انتهى فتأمل. انتهى قول الراقم.

আহলে হাদীস আলিমগণের মাযহাব

এই উপমহাদেশে কিছু আলেম এমনও আছেন, যারা ইলমে ফিকহ মূলত চার মাযহাবের ফকীহগণের নিকট থেকেই গ্রহণ করেন এবং হাদীস ও শরহে হাদীস (ব্যাখ্যা)ও সাধারণত ঐ সকল মুহাদ্দিসীনের নিকট থেকে নিয়ে থাকেন, যারা ফিকহের ক্ষেত্রে কোনো না কোনো ফকীহ ইমামের অনুসারী। কিন্তু কোনো বিভ্রান্তিবশত তারা নিজেদেরকে চার মাযহাবের কোনো একটির সাথে সম্বন্ধ করা থেকে বিরত থাকেন এবং নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে পরিচয় দেন।

তাদের হাদীস অনুযায়ী আমলের পন্থা কতদূর সুন্নাহসম্মত বা সালাফের মাসলাকের সাথে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ সে প্রসঙ্গে আপাতত না গিয়ে তাদের কিছু অনুসরণীয় আলিমের সিদ্ধান্ত নকল করা মুনাসিব মনে করা হয়েছে।

1. মাওলানা ছানাউল্লাহ আমরতসরী (১২৮৭-১৩৬৭ হি.)

তাঁর ফতোয়া-সংকলন মাওলানা মুহাম্মাদ দাউদ দারাযের তত্ত্বাবধানে দুই খন্ডে 'ফতোয়ায়ে ছানাইয়্যাহ'' নামে প্রকাশিত হয়েছে, যার নজরে ছানী (নিরীক্ষণ) করেছেন মাওলানা আবু সায়ীদ শরফুদ্দীন। এ সংকলনে আলোচিত মাসআলাটিও আছে। এক প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা আমরতসরী রাহ. লেখেনঃযদি কাছাকাছি এলাকা থেকে

নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, চাঁদ দেখা গেছে তাহলে আপনি সে অনুযায়ী হিসাব রাখবেন, পরে একটি রোযা কাযা করবেন। আর দূরের সাক্ষ্য আপনার জন্য দলীল নয়। (ফতোয়ায়ে ছানাইয়্যাহ ১/৬৫৭)

তিনি এ-ও লিখেছেন যে‒আহলে হাদীসের কাছে দূর-দূরান্তের চাঁদ দেখা দলীল নয়। এ ফয়সালা সাহাবা-যুগেই সম্পন্ন হয়েছে।

তার ভাষায়-

.اہل حدیث کے نزدیك دور دراز کی رویت ہلال حجت نہیں، یہ فیصلہ صحابۂ کرام کے زمانہ میں ہو چکا ہے

(ফতোয়ায়ে ছানাইয়্যাহ ১/৬৬৩)

আরেক আহলে হাদীস আলেম মাওলানা আবু সায়ীদ মুহাম্মাদ শরফুদ্দীন দেহলভী লেখেন‒অন্য শহরের চাঁদ দেখা ধর্তব্য হওয়ার ক্ষেত্রে দূরত্ব অর্থাৎ মাইল নির্ধারণে কিতাব ও সুন্নাহর কোনো স্পষ্ট নস নেই। এ কারণে উলামায়ে কেরামের ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত ও মাযহাবও এ বিষয়ে বিভিন্ন। এক্ষেত্রে ইখতিলাফে মাতালির ভিত্তিতে ফয়সালা করা ছাড়া অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নির্ভরযোগ্য নয়। ...

আলাদা উদয়স্থল এই যে, এক শহর বা স্থানে দিন আর অন্যত্র রাত। বা এক জায়গায় জোহরের সময় অন্যত্র আসর বা মাগরিবের সময়। এমন যদি হয় তাহলে ওখানের চাঁদ দেখা অন্যদের জন্য যথেষ্ট হবে না যে পর্যন্ত না তারা বা এক উদয়স্থলের অধিবাসীরা চাঁদ দেখবে। ...

সুতরাং যেখানে দুই শহরের উদয়াস্তের মাঝে তিন ঘণ্টার পার্থক্য হয় তা আলাদা উদয়স্থল বলে গণ্য হবে। আর যেখানে এর চেয়ে কম তা এ থেকে আলাদা হবে।

(ফতোয়ায়ে ছানাইয়্যাহ ১/৬৫৭, ৬৫৯, ৬৬৩-৬৬৪)

তৃতীয় আলিম মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আল আজমীর বক্তব্যও ''ফাতাওয়ায়ে ছানাইয়্যাহ''য় আছে। তিনি লিখেছেন-আহলে হাদীস আলিমগণের আমল এই যে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য।''

(ফতোয়ায়ে ছানাইয়্যাহ ১/৬৭৩, মাকতাবায়ে ছানাইয়্যাহ, সরগুধা)

2. মাওলানা আবদুল্লাহ রৌপড়ী রাহ. (আনুমানিক ১২৯৯-১৩৮৪ হিজরী)

তাঁর ফতোয়ার সংকলন প্রস্তুত করেছেন শায়খ আবুস সালাম মুহাম্মাদ সিদ্দীক এবং ''ফাতাওয়া আহলে হাদীস'' নামে প্রকাশ করেছেন। এ সংকলনে মাওলানা আবদুল্লাহ রৌপড়ীর বিস্তারিত ফতোয়া আছে। তিনি কুরাইবের হাদীস উল্লেখ করে লেখেন, ইমাম নববী রাহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ঐ লোকদের বক্তব্য রদ করছেন যারা বলেন, ইবনে আববাস রা. কুরাইবের বর্ণনার উপর এজন্য আমল করেননি যে, তাঁর কাছে এক সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন-

.لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا، وإنما رده لأن الرؤية لا يثبت حكمها في حق البعيد

অর্থাৎ ইবনে আববাস রা.-এর হাদীসের জাহিরের দাবি এই যে, সাক্ষী একজন হওয়ার কারণে নয়; বরং এ কারণে রদ করেছেন যে, দূরের লোকদের ক্ষেত্রে চাঁদ দেখার বিধান প্রযোজ্য হয় না।

ইমাম নববী যা বলেছেন ঠিক বলেছেন।

(আরো আলোচনার পর মাওলানা রৌপড়ী লেখেন) এ থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, সাক্ষী একজন হওয়ায় ইবনে আববাস রা. তা রদ করেননি; বরং দূরের সাক্ষ্য হওয়ায় তা রদ করেছেন। সুতরাং এ মাসআলা মজবুত হয়ে গেল যে, দূরের চাঁদ দেখা যথেষ্ট নয়। (ফতোয়ায়ে আহলে হাদীস ২/২০৯-২১১, প্রকাশক : ইদারায়ে ইহইয়াউস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা, সরগুধা, পাকিস্তান)

সামনে রৌপড়ী ছাহেব দূরত্বের পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন; যা তাঁর কিতাবে দেখা যেতে পারে।

3. শায়খ আবদুর রহমান কীলানী রাহ. (১৯২৩-১৯৯৫ ঈ.)

মাকতাবাতুস সালাম তাঁর ''ইসলাম কা নেযামে ফালাকিয়্যাত'' প্রকাশ করেছে, যাতে এ বিষয়ে ইলমুল ফালাক ও ইলমুল ফিকহ উভয় দিক থেকে আলোচনা করা হয়েছে। এতে তিনি লেখেন‌ পরবর্তী সময়ের কেউ কেউ উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় মনে করেন, কিন্তু সহীহ হাদীস ও প্রথম যুগসমূহের আছার এত নির্ভরযোগ্য যে, সেগুলোর মোকাবেলায় এই ব্যক্তিদের সিদ্ধান্তের কোনো মূল্য থাকে না।

(প্রবন্ধকারের নিবেদন, এমন বলা ঠিক নয়, ইজতিহাদী বিষয়ে দলীলের আলোকে আপনি একটি সিদ্ধান্তকে অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করতে পারেন, কিন্তু দ্বিতীয় সিদ্ধান্তও যেহেতু দলীলের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং ইজতিহাদের গন্ডির অন্তর্ভুক্ত তাই একে মূল্যহীন বলার অধিকার রাখেন না।)

যাইহোক, মাওলানা কীলানী সামনে উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার দলীলসমূহের জন্য বরাত দিয়ে বলেন-

''দেখুন : তিবয়ানুল আদিল্লাহ ফী ইছবাতিল আহিল্লা, শায়খ আবদুল্লাহ বিন হুমাইদ, আররঈসুল আম লিলইশরাফিদ দীনী মক্কা মুকাররমা।

এ পুস্তকের উর্দূ তরজমা করেছেন মুহাম্মাদ রফীক ছাহেব আছারী, যা আলইতিসামে ধারাবাহিকভাবে এবং 'মুহাদ্দিস'-এ (মুহাররম-সফর ১৩৯৫ হি.) একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এ পুস্তিকায় লেখক এ বিষয়ের সকল দিকের উপর আকলী-নকলী দলীল (যুক্তি ও বর্ণনা) দ্বারা প্রশান্তিদায়ক আলোচনা করেছেন। এ পুস্তিকা আলাদাও প্রকাশিত হয়েছে।''

সামনে গিয়ে মাওলানা কীলানী ''উদয়স্থলের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য হওয়ার শরয়ী দলীলসমূহ'' শিরোনামে আলোচনা করেছেন এবং তৃতীয় নম্বরে কুরাইবের সূত্রে ইবনে আববাস রা.-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপর চতুর্থ দলীল এ উল্লেখ করেছেন-

উদয়স্থলের বিভিন্নতা সম্পর্কে ইমাম ইবনে আবী শাইবা ''আলমুসান্নাফ'' গ্রন্থে এ আছার উল্লেখ করেছেন-

حدثنا ابن إدريس عن عبد الله بن سعيد، قال : ذكروا بالمدينة رؤية الهلال، وقالوا : أهل إستارة قد رأوه، فقال القاسم والسالم : ما لنا ولأهل إستارة.

আবদুল্লাহ ইবনে সায়ীদ বলেন, মদীনায় চাঁদ দেখার কথা উঠল। কিছু লোক বললেন, ইস্তারাবাসী চাঁদ দেখেছে, তখন কাসিম ও সালিম উভয়ে বললেন, ইস্তারাবাসীর সাথে আমাদের কী সম্পর্ক? (আলমুসান্নাফ ৬/২৮০)

(ইস্তারা মদীনা থেকে বেশ দূরে মক্কা মুকাররমার নিকটবর্তী একটি গ্রাম। এখন তা 'ওয়াদী সিতারা'' নামে পরিচিত। মক্কা থেকে এর দূরত্ব ১৮০ কিলোমিটার। টীকা, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা)

মাওলানা কীলানী বলেন, এ হাদীসগুলো থেকে পরিষ্কার জানা যায়, সাহাবায়ে কেরাম (ও তাবেয়ীন) নিজেদের অঞ্চলের সাক্ষ্যকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। অন্য অঞ্চলের সাক্ষ্যের বিষয়ে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। (ইসলাম কা নেযামে ফালাকিয়্যাত, মাওলানা আবদুর রহমান কীলানী, পৃষ্ঠা : ৭৩-৭৫)

আরো দেখা যায় : হাফেয মুহাম্মাদ সালাহুদ্দীন ইউসুফের কিতাব ''মাসআলায়ে রুয়াতে হিলাল আওর বারাহ ইসালামী মাহিনে'', পৃষ্ঠা : ১১৭-১৫৫, প্রকাশনায় : ইদারায়ে দারুস সালাম

4. বাংলাদেশে মাওলানা আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন রাহ. (২০০১ ঈ.)-এর রিসালা-'নতুন চাঁদ' আল্লামা আলীমুদ্দীন একাডেমী থেকে প্রকাশিত বিদ্যমান আছে। এতে (পৃষ্ঠা : ১০-১৬) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। এবং দূর-দূরান্তের শহর-নগরে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গায় ধর্তব্য না হওয়ার সিদ্ধান্তকেই তিনি হাদীসসম্মত বলেছেন।

5. তেমনি মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া উত্তর যাত্রাবাড়ির মাওলানা মোস্তফা ইবনে বাহরুদ্দীন-এর তত্ত্বাবধানে এ বিষয়ে একটি রিসালা প্রস্তুত হয়েছে, যার নাম 'আলকুরআন, সহীহ হাদীস, সালাফে সালেহীনের বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞানের আলোকে পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন প্রসঙ্গ''। এটি তাওহীদ পাবলিকেশন্স বংশাল থেকে প্রকাশিত। এটি সংকলন করেছেন জনাব আবদুর রশীদ ইবনু আলফায।

এতে ঐ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয়েছে, যা অন্যান্য আহলে হাদীস আলিমের মাসলাক।

একই মত গ্রহণ করা হয়েছে তাওহীদ পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত 'সৌদি আরবে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী রোযা শুরু ও ঈদ উদযাপন শরীয়তসম্মত নয়' পুস্তিকায়। লেখক : আবু আবদুল্লাহ আবদুর রাযযাক। এতেও শায়খ মোস্তফা কাসেমীর অভিমত রয়েছে। তেমনিভাবে আহলে হাদীস ঘরানার প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা 'আত-তাহরীক', আগস্ট ২০১৩ ঈ. সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ প্রসঙ্গ : সারাবিশ্বে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ'-এও একই মত গ্রহণ করা হয়েছে।

6. উপমহাদেশের আহলে হাদীস আলেমদের সাধারণ ফতোয়ার বিপরীতে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এমন আহলে হাদীস আলেমও আছেন। যেমন হিন্দুস্তানে নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান রাহ. (১২৪৮-১৩০৭ হি.) এবং বাংলাদেশে নিকট অতীতের একজন আলেম, মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী আলকুরাইশী (১৯০০-১৯৬০ ঈ.)।

নওয়াব সিদ্দীক হাসান রাহ.-এর লিখিত কিতাব 'আররওযাতুন নাদিয়্যাহ'য় (১/৫৩৭-৫৩৮) তিনি আল্লামা শাওকানীর অনুসরণে 'ইখতিলাফে মাতালে'র ধর্তব্য নয়-এই মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

আর মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী-এর নামে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত 'ফাতাওয়া ও মাসাইল' গ্রন্থে (পৃ. ১৭৬-১৮০) এ বিষয়ে একটি দীর্ঘ ফতোয়া ছাপা হয়েছে, যাতে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য নয় এবং এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য-এই মতটি গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য জনাব আবদুর রকীব ইবনে আলফাযের মতে এই ফতোয়াটি আবদুল্লাহিল কাফী রাহ.-এর নয়; বরং তা মূলত মাওলানা লুৎফল আলম ও মুহাম্মাদ ইসহাক আলী সরকারের। এ ব্যাপারে আমার মতামত সংরক্ষিত থাকল।

আরবের উলামা ও বিভিন্ন ফিকহ-ফতোয়া বোর্ডের ফয়সালা

অধিকাংশ আরব আলিম কোনো না কোনো মাযহাবেরই অনুসারী। কোনো আলেম সরাসরি কোনো মাযহাবের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত বা সম্বন্ধ না করলেও ফিকহ-ফতোয়া, ফিকহের কিতাব ও মাযহাব সম্পর্কে ইতিবাচক মানসিকতা পোষণ করেন। চার ইমামের প্রতি তাঁদের রয়েছে অনেক শ্রদ্ধা। আর সাধারণ মানুষের জন্য তাঁরা তাকলীদকে জরুরি মনে করেন। আলিমদের অনুসরণ ও তাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য উৎসাহিত করেন। তাবলীগী জামাত, আকাবিরে দেওবন্দকে গোমরাহ বলার আর মাযহাব ও তাকলীদকে গোমরাহী আখ্যা দেওয়ার যে প্রবণতা, তা সেখানের কোনো দায়িত্বশীল আলিম বা অনুসরণীয় মাশাইখের নয়। এটা মূলত কিছু অপরিপক্ক ইলমের অধিকারী আবেগপ্রবণ লোকের কাজ।

আলোচিত বিষয়ে আরবের কয়েকজন প্রসিদ্ধ শায়খের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করাও মুনাসিব মনে হচ্ছে, ওখানে যাঁদের বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

1. শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায রাহ. (যুলহিজ্জাহ ১৩৩০-২৭.১.১৪২০ হিজরী)

শায়খ ইবনে বায রাহ. উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাযহাবই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলতেন, এ কওলই সঠিক। ''মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে বায'' (১৫/৭৪, ৮৩)-এ এ বিষয়ে তাঁর একাধিক ফতোয়া রয়েছে।

এ সত্ত্বেও শায়খ পরিষ্কার বলেছেন, এ মাসআলা ইজতিহাদী ও ইখতিলাফী। 'হাইআতু কিবারিল উলামা'র ঐ সিদ্ধান্তেও তিনি স্বাক্ষর করেছেন, যার উদ্ধৃতি এ প্রবন্ধের প্রথম কিস্তিতে দেওয়া হয়েছে। বরং তিনি এ-ও বলেছেন-

وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن لكل بلد رؤيته إذا اختلفت المطالع ...، وهذا قول له حظه من القوة، وقد رأى القول به أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، جمعا بين الأدلة، والله ولي التوفيق.

অর্থ : এক জামাত আহলে ইলম এ দিকে গিয়েছেন যে, উদয়স্থল আলাদা হলে প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য এবং এ সিদ্ধান্তেরও (দলীলের দিক থেকে) শক্তি আছে। সৌদি আরবের 'হাইআতু

কিবারিল উলামা’র সদস্যগণ এ কওলই গ্রহণ করেছেন, যেন উভয় ধরনের দলীলের উপর আমল হয়। আল্লাহই তাওফীকদাতা। (মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে বায ১৫/৮৩)

যারা এ বিষয়ে প্রান্তিকতার শিকার তাদের জন্য শায়খের এ বক্তব্যে অনেক বড় শিক্ষা আছে; বরং শায়খ ইবনে বায রাহ. আরেক প্রশ্নের উত্তরে আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন। তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছেন, প্রতি বছর রমযানের শুরু ও শেষে বেশ অস্থিরতা দেখা যায়। মুসলিম দেশগুলোতে মতভেদ হয়-কেউ আগে ঈদ করে, কেউ পরে। এ সমস্যার সমাধান কী?

শায়খ জবাবে লেখেন-

الأمر واسع بحمد لله، ولكل أهل بلد رؤيتهم، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما

“আলহামদুল্লিাহ! বিষয়টিতে প্রশস্ততা আছে (এতে কোনো সংকট নেই যে, অস্থির হতে হবে) আর যেমনটা আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকে প্রমাণিত যে, প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের জন্য আলাদা চাঁদ দেখা ধর্তব্য।”

সামনে শায়খ বলেন, এক জামাত আহলে ইলম এ অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ যদি সৌদিতে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয় আর শাম ও মিসরের অধিবাসীরাও রোযা রাখেন তাহলে তা ভালো। কারণ হাদীসসমূহ আম ও সাধারণ। আর যদি রোযা না রাখেন বরং নিজেদের এলাকার চাঁদ অন্বেষণ করেন ও নিজেদের চাঁদ দেখা অনুসারে রোযা রাখেন তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই। সৌদিয়ার ‘হাইআতু কিবারিল উলামা’ থেকে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, ইবনে আববাস রা.-এর উপরোক্ত হাদীস এবং এর সমার্থক বর্ণনাসমূহের ভিত্তিতে প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য।

শায়খের আরবী ইবারতের মূল অংশ নিম্নরূপ-

فإذا ثبتت في المملكة العربية السعودية مثلاً، وصام برؤيته أهل الشام ومصر وغيرهم فحسن، لعموم الأحاديث، وإن لم يصوموا وتراءوا الهلال وصاموا برؤيتهم فلا بأس ...

(মাজমূউ ফাতাওয়া ১৫/৮৪-৮৫)

এ বিষয়ে শায়খ ইবনে বায রাহ.-এর আরো কিছু ফতোয়া সামনে অন্য কোনো প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

2. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আলউছাইমীন রাহ. (২৭.০৯.১৩৪৭-১৫.১০.১৪২১ হিজরী)

শায়খের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, রোযা ও ঈদে যেন গোটা উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এজন্য কিছু লোক মনে করেন, শুধু মক্কা মুকাররমার ‘মাতলা’ উদয়স্থলকেই বুনিয়াদ বানানো হোক। এ বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত কী?

তিনি যে জবাব দিয়েছেন তার সারকথা এই যে, যখন এটা স্বীকৃত যে, উদয়স্থল আলাদা হয়ে থাকে তাহলে দলীলের দাবি প্রত্যেক এলাকার হুকুম আলাদা হওয়া, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে (রমযান) মাস পাবে সে যেন তার রোযা রাখে। (সূরা বাকারা ২ : ১৮৫)

তো এখন যদি মক্কায় চাঁদ উদিত হওয়ার কারণে মক্কাবাসীরা এ মাসে উপনীত হল আর অন্যরা তাদের অঞ্চলে চাঁদ না উঠায় উপনীত হল না তাহলে আয়াতের হুকুম তাদের জন্য কীভাবে প্রযোজ্য হবে? হাদীসে আছে,'তোমরা চাঁদ দেখলে রোযা রাখবে, চাঁদ দেখলে রোযা শেষ করবে।' (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৫৬৭)

তো মক্কাবাসীদের চাঁদ দেখার কারণে পাকিস্তান ও তারও পূবের লোকদের কীভাবে রোযা রাখতে বাধ্য করব? অথচ আমরা জানি যে, তাদের দিগন্তে চাঁদ ওঠেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো রোযাকে চাঁদ দেখার সাথেই যুক্ত করেছেন।

আরো আলোচনার পর শায়খ পুনরায় বলেন, দলীলের দাবি এটাই যে, প্রত্যেক জায়গার জন্য আলাদা বিধান হবে। (মক্কার 'মাতলা' (উদয়স্থল)-কে সব অঞ্চলের জন্য বুনিয়াদ বানানো ঠিক নয়) তাঁর আরবী ইবারতের শেষ অনুচ্ছেদ এই-

فمقتضى الدليل الأثري والنظري أن نجعل لكل مكان حكما خاصا به فيما يتعلق بالصوم والفطر، ويربط ذلك بالعلامة الحسية التي جعلها الله في كتابه وجعلها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، ألا وهو شهود القمر (الهلال)، وشهود الشمس أو الفجر.

(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আলউছাইমীন পৃষ্ঠা : ৪৫১, মাসআলা : ৩৯৩)

এ বিষয়ে শায়খের কিতাব "আশশরহুল মুমতি" লিযাদিল মুসতাকনি" (৬/৩০৯-৩১০) এবং "ফিকহুল ইবাদাত'-এও আলোচনা আছে, যার সারকথা এই যে, তিনি ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার সিদ্ধান্তকেই অগ্রগণ্য মনে করতেন। যদিও বিপরীত মতটিও তাঁর কাছে ছিল একটি দলীলভিত্তিক ইজতিহাদী মত।

ঢাকার সৌদি দূতাবাসের 'আলমালহাকুদ দ্বীনী'র একজন কর্মকর্তার পক্ষ থেকেও শায়খের কাছে একটি প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল, তাতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আমাদের সঙ্গীরা তিন দলে বিভক্ত হয়েছেন : কেউ বলেন, আমরা রোযা-ঈদ সৌদিয়ার সাথে করব। কেউ বলেন, বাংলাদেশের সাথে করব। আর কারো মত হচ্ছে, (রমযানের) রোযা বাংলাদেশের সাথে রাখা হবে তবে আরাফার রোযা সৌদিয়ার সাথে। (প্রশ্নকারী : আহমদ ইবনে আলী আররূমী)

শায়খ ২৮/৮/১৪২০ হি. তারিখে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তিনি লেখেন, এ বিষয়ে আলিমদের ইখতিলাফ আছে যে, ঐ লোকদের জন্য, যারা অভিন্ন উদয়স্থল বা অভিন্ন শাসনের অধীনে বসবাসকারী। এ প্রসঙ্গে একাধিক মত আছে।

এরপর শায়খ তার নিজের কাছে অগ্রগণ্য মতটি উল্লেখ করার পর লেখেন-

ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأمر حاكم البلاد بالصوم أو الفطر وجب امتثال أمره، لأن المسألة خلافية، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سواء وافق بلادكم الأصلي أو خالفه، وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه.

অর্থ : কিন্তু যদি উভয় শহর (যেখানে চাঁদ দেখা গেছে আর যেখানে চাঁদ দেখা যায়নি) একই শাসনের অধীনে থাকে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে রোযা বা ঈদের হুকুম দেওয়া হয় তাহলে সে হুকুমের অনুসরণ করা জরুরি। কারণ এ মাসআলা 'ইখতিলাফী'। আর শাসকের ফয়সালা (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে) 'ইখতিলাফ' (এর কার্যকারিতা) রহিত করে দেয়। (অর্থাৎ এ ধরনের ইখতিলাফী বিষয়ে শাসক কোনো এক মাসলাক অনুসারে ফয়সালা করলে অন্য মাসলাকের অনুসারীদেরও সে ফয়সালা অনুসারে আমল করা জরুরি হয়ে যায়) সুতরাং তোমরা যে দেশে থাক সেখানের অধিবাসীরা যেদিন রোযা শুরু করে তোমরাও ঐদিন শুরু করবে। আর যেদিন তারা রোযা শেষ করে তোমরাও ঐদিন শেষ করবে তা তোমাদের নিজ দেশের অনুযায়ী হোক বা না হোক। একইভাবে আরাফার দিনের ক্ষেত্রেও ঐ দেশের অনুসরণ করবে যেখানে তোমরা থাক। (মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল ১৯/৪০-৪১; আলইজায ফী বা'যি মাখতালাফা ফীহিল আলবানী ওয়াবনু উছাইমীন ওয়াবনু বা'য ২/৫০১-৫০২)

ফতোয়াটি (পূর্ণ আরবী মতনসহ) শায়খ মুস্তাফা ইবনে বাহরুদ্দীনের তত্ত্বাবধানে প্রস্ততকৃত কিতাবেও ছাপা হয়েছে। পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন প্রসঙ্গ। (দ্র. পৃষ্ঠা : ৭৯-৮১)

3. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে জিবরীন (১৩৫৩ হি.-২০ রজব ১৪৩০ হিজরী)

লোকেরা কি সৌদিয়ার চাঁদ অনুসারে রোযা ও ঈদ করবে, না নিজেদের ভূ-খন্ডের চাঁদ দেখা অনুসরণ করবে-এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন-

هذه المسألة خلافية ...، الراجح القول الثاني : وهو أن لكل أهل بلد رؤيتهم إذا كان هناك مسافة بين البلدتين يمكن أن لا يرى في البلدة الأخرى، وهذا ما عليه العمل، وبالله التوفيق.

এ বিষয়ে ইখতিলাফ আছে। অগ্রগণ্য সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখাই অনুসরণীয় যদি দুই অঞ্চলের মাঝে এ পরিমাণ দূরত্ব হয় যে, (এক জায়গায় চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়া সত্ত্বেও) অন্য জায়গায় দৃষ্টিগোচর না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ সিদ্ধান্ত অনুসারেই আমল চলছে। (ফাতাওয়াস সিয়াম, ইবনে জিবরীন, পৃষ্ঠা : ২৬-২৭; ফাতাওয়া রমাদান ফিস সিয়াম ওয়াল কিয়াম ..., সংকলন : আবু মুহাম্মাদ আশরাফ ইবনে আবদুল মাকসূদ ১/১০৬)

4. শায়খ সালেহ আলফাওযান, হাফিযাহুল্লাহু ওয়া রাআহু

আরবের শায়খগণের মাঝে তাঁর অবস্থানও উল্লেখযোগ্য। হাইআতু কিবারিল উলামার সদস্য। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল : সৌদিয়ায় শনিবারে রোযা শুরু হল আর আলজাযাইরে রবিবারে। এখন আলজাযাইরের কোনো অধিবাসী যদি সৌদিয়ার সাথে রোযা শুরু করে তাহলে তা জায়েয হবে কি না? অতপর তিনি ঈদ করবেন কাদের সাথে? সৌদিয়ার সাথে করলে সমস্যা এই যে, তার দেশে ঐদিন রোযা চলছে আর সেদিন রোযা রাখলে সমস্যা এই যে, যাদের সাথে তিনি রোযা শুরু করেছিলেন তারা এদিন ঈদ করছে!

শায়খ সালেহ উত্তরে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা ফরয হওয়াকে চাঁদ দেখার সাথে যুক্ত করেছেন। আর আলিমদের দুই কওলের মাঝে সহীহ কওল অনুসারে উদয়স্থলের ভিন্নতার কারণে চাঁদের বিধান ভিন্ন হয়। যেহেতু আলজাযাইরের উদয়স্থল নিঃসন্দেহে সৌদিয়ার উদয়স্থল থেকে আলাদা তাই প্রত্যেক ব্যক্তি যে ইকলীম ও যে শহরে অবস্থান করছে সেখানের লোকেরা যখন চাঁদ দেখবে তখন তাদের সাথে রোযা রাখবে এবং তাদের সাথেই ঈদ করবে। এ কারণে আপনার হুকুম ঐ সকল মুসলমানের মতোই, যেখানে আপনি অবস্থান করছেন। আলজাযাইর হোক বা অন্য কোনো শহর। আপনি তাদের সাথেই রোযা রাখবেন এবং তাদের সাথেই ঈদ করবেন।

আরবী ইবারতের মূল অংশ এই-

فعلق صلى الله عليه وسلم وجوب الصيام برؤية الهلال، وذلك يختلف باختلاف المطالع على الصحيح من قولي العلماء ...، فكل إنسان يصوم مع أهل الإقليم وأهل البلد الذي هو فيه إذا رأوا الهلال ويفطر معهم، فأنت حكمك حكم المسلمين الذين تسكن معهم ... .

(মাজমূউ ফাতাওয়াশ শায়খ সালিহ আলফাওযান ১/৩৮৭)

আরো দেখুন : আলমুনতাকা মিন ফাতাওয়াশ শায়খ সালেহ আলফাওযান ৩/১২৪; মিন ফাতাওয়াল উলামা ফিস সিয়ামি ওয়াল কিয়াম, ইশরাফ, মুসা ইউনুস, পৃষ্ঠা : ৬০

5. সৌদি আরবের হাইআতু কিবারিল উলামার সিদ্ধান্ত প্রবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। শায়খ ইবনে বায রাহ.ও নিজ ফতোয়ায় এর বরাত দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, (দলীলের দিক থেকে) এই সিদ্ধান্তে গৃহীত মাসলাকেও শক্তি আছে; বরং এ কওলের উপর আমল করা হলে এ মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট উভয় মাসলাকের দলীলের উপর আমল হবে।

6. সৌদি আরবের মানুষের দ্বীনী প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য একটি জাতীয় ফতোয়া বোর্ড আছে, যার নাম 'আললাজনাতুদ দাইমা লিল বুহুছিল ইলমিয়্যাতি ওয়াল ইফতা'। ফিকহ-হাদীস ও অন্যান্য ইলমের মাহির ব্যক্তিবর্গ এ বোর্ডের সদস্য হয়ে থাকেন, যারা গ্রান্ড মুফতীর অধীনে কাজ করেন। এ বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়াসমূহের একটি বড় সংকলন মুদ্রিতও আছে। ওখান থেকে একটি ফতোয়ার সারসংক্ষেপ উল্লেখ করছি।

বোর্ডকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আমরা রেডিওতে সৌদিয়ায় রোযা শুরু হওয়ার সংবাদ শুনি অথচ আমাদের এখানে আইভরি কোস্ট, গিনি, মালি ও সেনেগালে খুব গুরুত্বের সাথে চাঁদ খোঁজার পরও কোথাও চাঁদ দেখা যায়নি। এ কারণে আমাদের মাঝে মতভেদ হয়ে যায় : কিছু লোক তো সৌদিয়ায় রোযা শুরু হওয়ার সংবাদ শুনে রোযা শুরু করেন। আর অধিকাংশ লোক আল্লাহ তাআলার ইরশাদ-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী-

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

এর উপর আমল করে নিজেদের এলাকায় চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার অপেক্ষা করেন। এখন দুই দলের মাঝে খুব বিবাদ হচ্ছে। অনুগ্রহ করে আমাদের ফতোয়া দিবেন।

বোর্ডের পক্ষ হতে যে ফতোয়া দেয়া হয়েছে তার সারসংক্ষেপ এই :

এটি একটি ইজতিহাদী বিষয়। এ কারণে আলিমদের মধ্যে ইখতিলাফ হয়েছে : প্রত্যেক দল কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ ও কিয়াস দ্বারা দলীল দিয়েছেন; বরং এমনও হয়েছে যে, উভয় দল একই নস দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছে। যেমন নিম্নোক্ত নসগুলো-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ ও فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه ও অন্যান্য।

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

(এই নসগুলো উভয় দলই দলীল হিসেবে পেশ করেছে।)

এটা এ কারণে যে, ইজতিহাদী মাসআলাসমূহে নস বোঝা ও তা থেকে হুকুম বের করার মাঝেও মতভেদ হয়। তবে এ মতভেদ মন্দ প্রভাব থেকে মুক্ত। কারণ প্রত্যেকের উদ্দেশ্য ভালো ছিল (কর্মপন্থা সঠিক ছিল) এবং প্রত্যেক মুজতাহিদ অন্য মুজতাহিদের ইজতিহাদকে মূল্য দিতেন।

সুতরাং যখন ফিকহের পূর্বের ইমামদের মাঝে এ বিষয়ে ইখতিলাফ হয়েছে এবং প্রত্যেকের কাছে দলীল আছে এ কারণে আপনাদের কর্তব্য, যখন আপনাদের কাছে অন্য উদয়স্থলে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়া প্রমাণিত হবে তখন আপনারা নিজে এতে হস্তক্ষেপ করবেন না; বরং একে আপনাদের রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলের উপর ছেড়ে দিবেন। তারা রোযার ফয়সালা করুন বা সেদিন রোযা শুরু না করার সিদ্ধান্ত নিন উভয় অবস্থায় আপনার জন্য তাদের আনুগত্য করা ফরয। কারণ এ ধরনের মাসআলায় শাসকের ফয়সালা ইখতিলাফের সমাপ্তি ঘটায়।

এ পদ্ধতি অনুসরণ করলে আপনাদের পরস্পর কোনো বিবাদ থাকবে না। বরং ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন এবং নবী পাক ও তার আল ও আসহাবের উপর রহমত নাযিল করুন।

আবদুর রাযযাক আফীফী, নায়েবে রঈস

আবদুল্লাহ ইবনে মানী, সদস্য

আবদুল্লাহ ইবনে গাদায়ান, সদস্য।-ফাতাওয়াল লাজনাতিত দায়িমা ১০/৯৬

7. রাবেতাতুল আলামিল ইসলামীর অধীনে নতুন-পুরাতন মাসাইলের তাহকীকে নিয়োজিত মজলিস, যার নাম ‘আলমাজমাউল ফিকহিল ইসলামী মক্কা মুকাররমা’ এবং সংক্ষেপে যাকে ‘মাজমাউ মক্কা’ বলা হয়, এর চতুর্থ দাওরায় (ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ ঈ.) ‘চাঁদের ঐক্য’ বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, যার মূল অংশ আলকাউসারের শাওয়াল ১৪৩৪ হি. সংখ্যায় উদ্ধৃত হয়েছে সেই সিদ্ধান্তেই ‘ইখতিলাফুল মাতালি’ উদয়স্থলের বিভিন্নতার প্রসঙ্গটিও আলোচনায় এসেছে এবং ঐ সিদ্ধান্তে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, মাজমা উদয়স্থলের বিভিন্নতার প্রসঙ্গটির উপর ‘দিরাসাহ’ (গবেষণা) করেছে এবং উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাসলাকটিই তাঁরা গ্রহণ করেছেন। তাদের

বক্তব্য, এতে মুকাল্লাফদের জন্য সহজতাও আছে। আর কিয়াসের দাবিও তা-ই। আর এর পক্ষে শরয়ী দলীলও রয়েছে।

لقد درس المجمع الفقهي الإسلامي مسألة اختلاف المطالع، ...، ففي مسألة الأهلة ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية ...، كما ذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع، لما في ذلك من التخفيف على المكلفين، مع كونه هو الذي يقتضيه النظر الصحيح، فما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد في يومي الصوم والإفطار مخالف لما جاء شرعا وعقلا ...

وكثير من كتب أهل المذاهب الأربعة طافحة بذكر اعتبار اختلاف المطالع، للأدلة القائمة من الشريعة بذلك، وتطالعك الكتب الفقهية بما يشفي العليل ...

(কারারাতুল মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, মক্কা মুকাররমা, পৃষ্ঠা : ৮৭-৮৮)

শাওয়ালের সংখ্যায় গোটা মুসলিম জাহানের ঐ সকল আকাবির ও মাশাইখের নামও উল্লেখ করা হয়েছে, যারা এ সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করেছেন।

৪. এদিকে মিসরের কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার ফতোয়া-সংকলনে বলা হয়েছে যে, অগ্রগণ্য মত এই যে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়। এ-ও বলা হয়েছে যে, ১৩৮৬ হি. মোতাবেক ১৯৬৬ ঈ. তে আলআযহারের 'মাজমাউল বুহূসিল ইসলামী'র পক্ষ হতে যে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে এ ফয়সালাই হয়েছে।

একারণে ঐ ফতোয়ায় লেখা হয়েছে-

متى تحققت رؤية هلال رمضان في بلد من البلاد الإسلامية فإنه يجب الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع البلد الإسلامي الذي ثبتت فيه الرؤية في جزء من الليل، ما لم يقم ما يناهض هذه الرؤية ويشكك في صحتها، امتثالا لقوله تعالى : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، والحديث الشريف : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.

অর্থ : কোনো ইসলামী শহরে রমযানের চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে যত শহর ঐ শহরের সাথে রাতের কোনো অংশে শরিক ঐসকল শহরে অবস্থানরত মুসলমানদের উপর রোযা ফরয হয়ে যাবে।**যদি না এমন কোনো বিষয় সামনে আসে**, যা এই চাঁদ দেখার বিশুদ্ধতাকে সংশয়যুক্ত করে দেয়। এ বিধান আল্লাহ তাআলার ইরশাদ-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

ও হাদীসের হুকুম-

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

-এর কারণে। (আলফাতাওয়াল ইসলামিয়া ২০/৭৪৪৬-৭৪৫০, আওকাফ মন্ত্রণালয়, মিসর)

তো মিসরের কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার সিদ্ধান্ত এই যে, যে সকল শহর চাঁদের শহরের সাথে (যে শহরে চাঁদ দেখা গেছে) রাতে শরিক নয় এখানে চাঁদের ফয়সালা হল আর ওখানে সুবহে সাদিক, তো তাদের জন্য এ চাঁদ দেখা প্রযোজ্য নয়। এর অর্থ, যে এলাকায় চাঁদ দেখা গেল সেখানে চাঁদের ফয়সালা হতে হতে যেসব এলাকায় সুবহে সাদিক হয়ে যায় সেখানে এ চাঁদ দেখা ধর্তব্য হবে না; বরং এর দাবি তো এ-ও যে, ঐ অঞ্চলে চাঁদের ফয়সালা

হওয়ার পর যেসব অঞ্চলের অধিবাসী সহজভাবে সাহরী ও নিয়ত করার সময় পাবেন না তাদের জন্যও এ চাঁদ দেখা প্রযোজ্য হবে না। যেমনটা কুয়েতের দারুল ইফতার ফতোয়ায় স্পষ্ট বলা আছে।

এখান থেকে বোঝা গেল, যে আলিমগণ উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় মনে করেন তাদের কাছেও এ হুকুম এত ব্যাপক নয় যে, চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার সময় যে সকল অঞ্চলে সুবহে সাদিক হচ্ছে বা হয়েছে তাদের জন্যও তা প্রযোজ্য হবে। সামনে এ বিষয়ে আরো আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

9. কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা, কুয়েত

এই দারুল ইফতার ফতোয়ার সংকলনও মুদ্রিত ও প্রকাশিত। তা থেকে দুটি ফতোয়ার সারসংক্ষেপ তুলে ধরছি :

প্রথম ফতোয়াটি লেখা হয়েছে উত্তর আমেরিকার কোনো এক এলাকার মুসলিম অধিবাসীদের প্রশ্নের উত্তরে। ওখানে একটি মুসলিম সংগঠন আছে এবং সে সংগঠনের একটি হেলাল কমিটিও আছে। কোনো রমযানে আরব দেশগুলোতে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে মঙ্গলবারে ঈদের ঘোষণা হয়। কিন্তু আমেরিকার ঐ এলাকার কমিটি সেখানে চাঁদ দৃষ্টিগোচর না হওয়ার কারণে মঙ্গলবার ত্রিশ রমযান ঘোষণা করে।**এখন ঐ শহরের অধিবাসী কিছু আরব আরবের চাঁদ দেখা অনুযায়ী মঙ্গলবার ঈদ করেন। অন্যরা করেন ঐ শহরের অধিবাসীদের সাথে। এ প্রেক্ষাপটে যে প্রশ্ন কুয়েত ফতোয়া বোর্ডের সামনে উত্থাপিত হয় এর জওয়াবে তাঁরা লেখেন**-

'এ বিষয়ে আলিমদের দুটি সিদ্ধান্ত আছে :

ক. উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য এবং এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকায় অবশ্যঅনুসরণীয় নয়।

খ. যে কোনো ইসলামী শহরে চাঁদ দেখা গেলে সে অনুযায়ী সকল মুসলিমের আমল করা জরুরি যদি চাঁদ দেখার 'ইলম' (সংশয়হীন অবগতি) লাভ হয়।

উভয় মতের পক্ষেই দলীল আছে। কুয়েতের ফতোয়া বোর্ড ("আলহাইআতুল আম্মাহ লিলফাতাওয়া") দ্বিতীয় মতটিকে প্রাধান্য দেয় যেন রোযা ও ঈদে ঐক্য সম্ভব হয়। বোর্ড মুসলিম নেতৃবৃন্দের কাছে আশা রাখে যে, তাঁরা এ মতের উপর আমল করার জন্য সংশ্লিষ্ট স্বীকৃত নীতিমালা অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

وتأمل الهيئة العامة للفتوى بالكويت من زعماء المسلمين اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بهذا الرأي مع ملاحظة ما لا بد منه من الضوابط العلمية المسلمة.

কুয়েত কেন্দ্রীয় ফতোয়া বোর্ড উপরের ফতোয়ায় তাদের সিদ্ধান্ত বর্ণনার পর তৎক্ষণাৎ নিম্নোক্ত নোট লেখেন-

ولكن لما كان العمل في البلاد الإسلامية جاريا على الرأي الأول وهو اختلاف المطالع، وأن لكل بلد رؤيته، فترى الهيئة العامة للفتوى بالكويت أنه ينبغي على المسلمين في أمريكا الشمالية اتباع اللجنة المشكلة من جماعة المسلمين هناك، وأنه ينبغي طاعتها في هذا الأمر وسائر ما فيه مصلحة المسلمين، لأنه تقوم بالنسبة لمسلمي أمريكا مقام الهيئات الدينية الرسمية في البلاد الإسلامية، والله أعلم.

এই নোটের সারকথা এই যে, যেহেতু এখন পর্যন্ত মুসলিম দেশগুলোতে প্রথম মাসলাকের উপরই আমল চলছে, অর্থাৎ উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া এবং প্রত্যেক অঞ্চলে নিজ নিজ চাঁদ দেখা অনুসরণ করা, এ কারণে কুয়েত

ফতোয়া বোর্ডের সিদ্ধান্ত এই যে, উত্তর আমেরিকার মুসলিমদের উপর এখন মুসলিম সংগঠনের পক্ষ হতে নির্ধারিত কমিটির আনুগত্য করা জরুরি।

(মাজমূআতুল ফাতাওয়াশ শরইয়্যাহ, কুয়েত, ওযারাতুল আওকাফ ৩/৬৫-৬৬)

দ্বিতীয় ফতোয়াটি লেখা হয়েছে আর্জেন্টিনা থেকে প্রাপ্ত একটি প্রশ্নের উত্তরে। এতে বলা হয়েছে, যে শহরে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়েছে তার ইকলীমে যত শহর আছে এবং যে সকল শহর-নগর দ্রাঘিমা রেখায় শরিক এবং যেসব শহর এর পশ্চিমে অবস্থিত তাদের উপর এ চাঁদ দেখা অনুযায়ী আমলা করা জরুরি। আর যেসকল শহর চাঁদের শহরের পূর্ব দিকে অবস্থিত তাদের হেলাল কমিটির জন্যও ঐ চাঁদ দেখা অনুসারে ফয়সালা করার অবকাশ আছে, যদি এ শহর চাঁদের শহরের সাথে (অর্থাৎ যে শহরে চাঁদ দেখা গেছে) রাতের কোনো অংশে শরিক হয়। তবে ঈদের চাঁদের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, তাদের ২৯ রোযা পুরা হতে হবে। আর রমযানের চাঁদের ক্ষেত্রে শর্ত এই যে, তাদের এলাকায় যখন পশ্চিমের ঐ শহরের চাঁদ প্রমাণিত হচ্ছে তখন রাতের এ পরিমাণ সময় অবশিষ্ট থাকতে হবে যে, বিনা সংকটে সাহরী করার ও সুবহে সাদিকের আগে নিয়ত করার সুযোগ থাকে।

আরবী পাঠের একটি অংশ এই-

... ، وأما البلاد التي تقع على جهة الشرق من ذلك الإقليم وتشترك مع إقليم الرؤية في جزء من الليل، فإن لهيئة الرؤية في ذلك الإقليم أن تأخذ بتلك الرؤية في الإفطار من رمضان مطلقا إذا أتموا تسعة وعشرين يوما ...، وكذلك في دخول شهر رمضان إذا علموا بالرؤية وقد بقي من الليل عندهم ما يكفي لتبييت النية مع السحور دون ضيق.

(মাজমূআতুল ফাতাওয়াশ শরইয়্যাহ কুয়েত, ওযারাতুল আওকাফ ৪/৮৫-৮৯)

দ্বিতীয় ফতোয়া থেকে দুটি বিষয় সামনে এল :

ক) কোনো শহর যদি চাঁদের শহর থেকে এত দূরবর্তী হয় যে, ওখানে যখন চাঁদের ইলম হচ্ছে তখন এখানে হয়তো সুবহে সাদিক হয়ে গেছে বা রাতের এত সামান্য অংশ বাকি আছে যে, এ সময়ের মধ্যে শান্তভাবে সাহরী করা যায় না। তাহলে এ শহরের অধিবাসীদের নিজেদের চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করা উচিত। কুয়েত ফতোয়া বোর্ড সাধারণত উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় ঘোষণা করলেও উপরোক্ত ক্ষেত্রে তারাও উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য মনে করেন।

খ) যে ফকীহগণ এ কথা বলেন যে, এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য ধর্তব্য তাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, কেউ কোনো শহরে চাঁদের খবর দেখল বা শুনল অমনি সে তার সঙ্গীদের নিয়ে রোযা ও ঈদ করবে; বরং উদ্দেশ্য এই যে, সংশ্লিষ্ট অথরিটি অর্থাৎ সরকার বা সরকারের পক্ষ হতে নির্ধারিত হেলাল কমিটি এই চাঁদ দেখার ইতিবার করে চাঁদের ফয়সালা করবে। এটি জনসাধারণের কাজ নয়, দায়িত্বশীলদের কাজ। সাধারণ জনগণের কর্তব্য দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করা।

কুয়েত ফতোয়া বোর্ডসহ অন্যান্য বোর্ড এবং অন্যান্য ফকীহ ও মুহাদ্দিসের এই ফয়সালা আলাদা শিরোনামে আরো কিছু স্পষ্ট বরাতসহ সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

10. মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী (জিদ্দা ফিকহ একাডেমী)

সফর ১৪০৭ হিজরী (মোতাবেক অক্টোবর, ১৯৮৬ ঈ.)-এর ওমানে অনুষ্ঠিত মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর মজলিসে এ মাসআলা আলোচিত হয়েছে। তাতে যে ফয়সালা হয় তা 'মাজমা'র মাজাল্লার বর্ণনা অনুযায়ী নিম্নরূপ :

إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع، لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار.

অর্থ, যে কোনো শহরে চাঁদ প্রমাণিত হলে সে অনুযায়ী সকল মুসলিমের আমল করা জরুরি। উদয়স্থলের ভিন্নতার কোনো ইতিবার নেই। কারণ (চাঁদ দেখা গেলে) রোযা রাখা এবং (চাঁদ দেখে) রোযা শেষ করার বিষয়ে যে বিধান (হাদীসে এসেছে) তা 'আম' বা সাধারণ। (মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, তৃতীয় দাওরা, তৃতীয় সংখ্যা, ২/১০৮৫, মুদ্রণ ১৪০৮-১৯৮৭)

মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী এখানে ঐ ফকীহগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যাদের মাসলাক, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়। এটি বিস্তারিত দিকনির্দেশনাহীন এক সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত। এতে এ ফয়সালা অনুসারে আমলের উপায় ও নীতিমালা সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। তেমনি উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার ভিত্তিতে রোযা ও ঈদে একতাবদ্ধতাকে ফরযও বলা হয়নি। অথচ আমাদের এখানের কিছু গায়রে আলিম লেখক মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর এ সংক্ষিপ্ত ফয়সালাকে এ কথার সমার্থক মনে করেছেন যে, মাজমা এখন সকল মুসলিমের উপর রোযা ও ঈদের একতাকে ফরয হওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছে। আর তারা একে শুধু মাজমার ফয়সালা নয়; বরং সরাসরি মুনাযযামাতুত তাআউনিল ইসলামী (পুরোনো নাম 'মুনাযযামাতুল মু'তামারিল ইসলামী') ওআইসির সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত করেছেন। তাদের উভয় কথাই ভুল। সামনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

সারসংক্ষেপ

উপরোক্ত সকল আলোচনার সারসংক্ষেপ এই দাঁড়াচ্ছে যে, এ বিষয়টি যেমন আগের যুগের চার মাযহাবের ফকীহদের মাঝে মতভেদপূর্ণ ছিল তেমনি এ যুগের ফকীহদের মাঝেও মতভেদপূর্ণ। এমন নয় যে, বর্তমান যুগে এসে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার বিষয়ে আলিমগণের ইজমা হয়েছে।

উপরের আলোচনা মনোযোগের সাথে পড়া হলে সম্ভবত আরো স্পষ্ট হয়েছে যে, পূর্ববর্তী-পরবর্তী ও সমসাময়িক ফকীহগণের অনেক বড় জামাত বরং বলতে গেলে তাদের অধিকাংশই দূর-দূরান্তের শহর-নগরে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলে অবশ্য-অনুসরণীয় না হওয়ার দিকেই রয়েছেন। আরব উলামা ও আহলে হাদীস আলিমগণেরও অধিকাংশই দলীলের দিক থেকে এ কওলকেই অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করেছেন।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, উপরের নিবেদনসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে সামনে আসে। তা হচ্ছে এ ধারণা করা যে, যে ফকীহই উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় মনে করেন তিনিই সারা বিশ্বে রোযা ও ঈদ এক করার প্রবক্তা-একান্তই ভুল। এ দুই বিষয় পরস্পর সংযুক্ত নয়। উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়া আর ঈদ ও রমযানের ঐক্য জরুরি হওয়া দুটো এক কথা নয়। তদ্রূপ উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, যে কেউ নিজের তরফ

থেকে ঈদ ও রমযানের ফয়সালা করতে পারে। বরং এ ফয়সালার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের। আর অন্যদের কর্তব্য তাদের আনুগত্য করা। সামনে এইবাস্তবতাগুলো আরো বিস্তারিত পেশ করার চেষ্টা করা হবে।

দূরবর্তী শহর বলতে কী বুঝায়?

আলহামদুলিল্লাহ, বিগত সংখ্যাগুলোয় আমরা সাহাবা-তাবিয়ীযুগের ফুকাহা, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, পরবর্তী ফুকাহা ও সমকালীন উলামা-মাশাইখের বক্তব্য পাঠ করেছি। আমরা দেখেছি যে, তাঁদের অনেক বড় এক জামাতের মাসলাক, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় নয়।

এখন দেখতে হবে যে, দূর দুরান্তের শহর বলতে কী বুঝায়? কোন্ শহরগুলোকে আমরা দূরবর্তী শহর বলব?

দলিল-প্রমাণ দ্বারা এটুকু তো প্রমাণিত যে, এখানে নিকট ও দূরের বিধান এক নয়, কিন্তু কোনো স্পষ্ট নসে যেহেতু দূরবর্তী এলাকার সুনির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখিত হয়নি তাই এখানে শরীয়তের সাধারণ নির্দেশনা অনুসারে উম্মাহর ফকীহগণ এ মাসআলাকে শরীয়তের নীতিমালার আলোকে ইজতিহাদের দ্বারা সমাধান করেছেন। আর স্বভাবতই এতে তাঁদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে :

১. হানাফী ফকীহগণের ‘ইবারত-উদ্ধৃতি আমরা যুলহিজ্জাহ ১৪৩৪ হি. ও মুহাররামুল হারাম ১৪৩৫ হি.-এর দুই সংখ্যায় পাঠ করেছি। আমরা দেখেছি, ইমাম কুদূরী রাহ. এবং তাঁর উস্তায আবু আবদুল্লাহ আল জুরজানী রাহ. থেকে নিয়ে ছাহেবে হিদায়া এবং তাঁর উস্তাযগণসহ আগের পরের হানাফী ফকীহগণের বড় এক জামাত নাদির রেওয়ায়েতের ঐ মাসআলাটির ব্যাখ্যা করেছেন। যাতে বলা হয়েছে, কোনো শহরবাসী যদি চাঁদ দেখে উনত্রিশটি রোযা রেখে ঈদ করে; পরে তাদের কাছে প্রমাণিত হয় যে অপর কোনো শহরবাসী চাঁদ দেখেই ত্রিশটি রোযা রেখেছে। তাহলে যারা উনত্রিশ রোযা রেখেছে তাদেরকে একটি রোযা কাযা করতে হবে। ঐসকল ফকীহ এই মাসআলার ব্যাখ্যায় বলেছেন, এই হুকুম তখন; যখন উভয় শহর কাছাকাছি হবে এবং তাদের উদয়স্থল অভিন্ন হবে। আর যদি উভয় শহরের মাঝে এই পরিমাণ দূরত্ব হয় যে সেগুলোর উদয়স্থল ভিন্ন, তাহলে এ বিধান নয়। কারণ এই ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় নয়। তাদের ঐসকল বক্তব্যের সারকথা এই যে, তাদের নিকট এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলে ধর্তব্য না হওয়ার ভিত্তি হলো ঐ অঞ্চলগুলোর উদয়স্থল ভিন্ন হওয়া।

ফিকহে শাফেয়ীতে ইরাকী ফকীহগণের অধিকাংশের মাসলাকও এ-ই। ইমাম ইবনুস সাববাগ (আবু নসর আবদুস সাইয়েদ ইবনে মুহাম্মাদ (জন্ম : ৪০০ হি.-মৃত্যু : ৪৭৭ হি.) ইরাকী ‘তরীকা’র শায়খ আবু হামেদ আসফারাইনী (৩৪৪-৪০৬ হি.)-এর বরাতে নকল করেছেন-

إن كانا بلدين لا تختلف المطالع لأجلهما، كبغداد والبصرة، لزمهم برؤية بعضهم، وإن كانا بلدين تختلف المطالع فيهما، كالعراق والحجاز، والشام وخراسان، وما أشبه ذلك، لم يلزم أحدهما برؤية الآخر. (قال صاحب البيان : وحكاه ـ يعني ابن الصباغ ـ عن الشيخ أبي حامد).

এ উদ্ধৃতির মর্মার্থ হল, যে দুই শহরের উদয়স্থল আলাদা হয় না যেমন বাগদাদ ও বসরা, এক্ষেত্রে এক জায়গায় চাঁদ দেখা গেলে অন্য জায়গায় রোযা লাযিম হবে। পক্ষান্তরে দুই শহরের উদয়স্থল আলাদা হলে, যেমন ইরাক ও হিজায বা শাম ও খোরাসান, এক অঞ্চলের চাঁদের দ্বারা অন্য অঞ্চলে রোযা লাযিম হবে না।

ইবনুস সাববাগ থেকে এ ইবারত ইমাম আবুল হুসাইন ইয়াহইয়া ইবনে আবুল খায়ের আলইমরানী আশশাফেয়ী (৪৮৯-৫৫৮ হি.) 'আলবায়ান'' খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৮০-এ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম নববী রাহ. ''শারহুল মুহাযযাব'' কিতাবে লিখেছেন-

أصحها : وبه قطع جمهور العراقيين والصيدلاني وغيرهم، أن التباعد يختلف باختلاف المطالع.

অর্থাৎ অধিক বিশুদ্ধ 'ওয়াজহ' এই যে, দূরবর্তী হওয়ার সিদ্ধান্ত উদয়স্থলের ভিন্নতার বিচারে হবে। ইরাকী ফকীহগণের অধিকাংশ এবং সয়দলানী ও অন্যরা দ্ব্যর্থহীনভাবে এ কথাই বলেছেন। (আলমাজমূ ৭/৪২৭)

'সয়দালানী' বলে আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে দাউদ সয়দালানীকে নির্দেশ করা হয়েছে। যিনি আবু বকর আদদাউদী নামেও প্রসিদ্ধ। ইনি খোরাসানী 'তরীকা'র শায়খ কাফফাল মারওয়াযীর শাগরিদ। ''মুখতাসারুল মুযানী''র উপর তাঁর ভাষ্যগ্রন্থ ''আততরীকাতুস সয়দালানিয়্যাহ'' নামে প্রসিদ্ধ। তাজুদ্দীন আসসুবকীর ''তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা''য় (খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৪৮-১৮৯; এবং খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৬৪) তাঁর 'তরজমা' (পরিচিতিমূলক আলোচনা) রয়েছে।

দুই অঞ্চলের মাঝে পার্থক্যের এ মাপকাঠির উপর ইনশাআল্লাহ আরো কিছু আলোচনার ইচ্ছা আছে। এর আগে দ্বিতীয় মতটি উল্লেখ করছি।

২. দূরবর্তী শহর-নগরের সংজ্ঞায় শাফেয়ী ফকীহগণের দ্বিতীয় মাসলাক এই যে, চাঁদের শহর (যে শহরে চাঁদ দেখা গেছে) থেকে যে শহর কসরের দূরত্বে অবস্থিত, একে দূরবর্তী ধরা হবে আর যা এর চেয়ে কম দূরত্বে অবস্থিত তাকে 'নিকটের' বলা হবে।

খোরাসানী 'তরীকা'র শায়খ কাফফাল মারওয়াযী (৩২৭-৪১৭ হি.)-এর শাগরিদ আবুল কাসেম আলফূরানী (৪৬১হি.), ইমামুল হারামাইন আবদুল মালিক ইবনুল জুয়াইনী (৪১৯-৪৭৮ হি.), তাঁর শাগরিদ ইমাম গাযালী (৫০৫ হি.) ও মুহিউস সুন্নাহ বগভী (৫১৬ হি.)সহ অনেক খোরাসানী ফকীহ এ মাসলাকেরই প্রবক্তা।

ভারতবর্ষের বড় আলিমগণের মাঝে হযরত শাহ ওলিউল্লাহ রাহ. ''আলমুসাফফা শরহুল মুয়াত্তা''য় (খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৩৭) এ মাসলাকই সমর্থন করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর ফার্সী ইবারত মুহাররম ১৪৩৫ হি. সংখ্যায় আমরা দেখেছি। তাতে তিনি আপন ইজতিহাদ অনুযায়ী এ মাসলাকের ব্যাখ্যা পেশ করারও চেষ্টা করেছেন। আহলে ইলম পাঠক তাঁর ঐ ইবারত আবার দেখে নিতে পারেন।

উল্লেখ্য, ফিকহে শাফেয়ীতে কসরের দূরত্ব বর্তমান পরিভাষা অনুসারে ৮৯.৪০০ কিলোমিটার।

সহীহ মুসলিম এর ভাষ্যগ্রন্থে (খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৯৭) باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم শিরোনামের আলোচনায় ইমাম নববী রাহ. যদিও এ মাসলাককে প্রাধান্য দিয়েছেন অর্থাৎ কসরের দূরত্বকে মানদন্ড সাব্যস্ত করেছেন, কিন্তু 'শরহুল মুহাযযাব' গ্রন্থে- যেমনটা আমরা দেখেছি-প্রথম মাসলাককে 'আসাহ' (অধিক শুদ্ধ) বলেছেন তেমনি ''আলমিনহাজে''ও; বরং শরহুল মুহাযযাবে দ্বিতীয় মাসলাককে স্পষ্ট ভাষায় 'জয়ীফ'ও বলেছেন। তিনি লেখেন-

.وهذا ضعيف، لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر، فالصحيح اعتبار المطالع كما سبق

অর্থাৎ কসরের দূরত্বকে মাপকাঠি বানানো দুর্বল। কারণ কসরের দূরত্বের সাথে চাঁদের কোনো সম্পর্ক নেই। এ কারণে সঠিক হচ্ছে উদয়স্থলের ভিন্নতাকে মাপকাঠি বানানো। (আলমাজমূ খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪২৮)

উদয়স্থলের অভিন্নতা ও ভিন্নতার অর্থ কী?

দুই এলাকার উদয়স্থল এক বা আলাদা হওয়ার এক অর্থ তো এই যে, জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হবে যে, কোন কোন এলাকা নতুন চাঁদ দর্শনযোগ্য হওয়ার আওতার মধ্যে আর কোন কোন অঞ্চল এর বাইরে। ভিতরের অঞ্চলগুলোর মধ্যে কোন অঞ্চল থেকে চাঁদ খুব সহজেই দৃষ্টিগোচর হতে পারে আর কোন অঞ্চল থেকে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়া সহজ নয়, বরং শুধু প্রখর দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন এবং চাঁদের অবস্থান সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ও চাঁদ দেখার বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই দেখতে পারে। তেমনি কোথা থেকে খোলা চোখে চাঁদ দেখা যাবে আর কোথা থেকে শুধু টেলিস্কোপের মাধ্যমে দেখা যাবে। তো যে যে অঞ্চল নতুন চাঁদ দর্শনযোগ্য হওয়ার আওতাভূক্ত হবে সেগুলোর উদয়স্থল এক, আর যেগুলো এর আওতার বাইরে; সেগুলোর উদয়স্থল ভিন্ন। এ আওতার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান থাকতে পারে। আবার আওতার শেষ প্রান্তের সাথে মিলিত পরবর্তী জায়গাটি নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও আওতার বাইরে হওয়ার কারণে তার উদয়স্থল ভিন্ন। এভাবে সূক্ষ্ম ও সুনির্দিষ্টভাবে দুই অঞ্চলের মাঝে এ ফয়সালা করা যে, এদের উদয়স্থল এক নাকি আলাদা। সেজন্যে জ্যোতির্বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শিতার প্রয়োজন। বিশেষ করে এজন্য যে, নতুন চাঁদের বয়স অবস্থা অবস্থান ও অন্যান্য কারণে পৃথিবী থেকে তার দর্শনযোগ্য হওয়ার আওতা পরিবর্তন হতে থাকে। যে অঞ্চলগুলো কোনো এক মাসে অভিন্ন উদয়স্থলে ছিল তা সব মাসেই অভিন্ন উদয়স্থলে থাকবে তা অপরিহার্য নয়; বরং এ খুবই সম্ভব, আর তা ঘটতেও থাকে যে, ঐ সকল অঞ্চলের কোনো কোনোটা কোনো কোনো মাসে আওতার বাইরে থেকে যাবে।

একথাগুলো এমনি তো জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা যাদের আছে তাদের কাছে স্পষ্ট। এরপরও জ্যোতির্বিদ্যার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেগুলো চাঁদের জন্ম ও ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তা দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্য সময় নির্দেশ করে থাকে তাদের সাইটসমূহ দেখলেও এসব বিষয় আরো স্পষ্ট হয়ে যায়, যেগুলোতে বিগত অনেক বছর ও ভবিষ্যতেরও বিবরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন :

1. যঃঃঢ়://সড়ড়হংরমযঃরহম.পড়স

2. যঃঃঢ়://ররর.রপড়ঢ়ৎড়লবপঃ.ড়ৎম

3. যঃঃঢ়://িি.যরষধষংরমযঃরহম.ড়ৎম

4.যঃঃঢ়://ফৎরাব.মড়ড়মষব.পড়স/ভড়ষফবৎংরব?রফ=0ই8জুঙএঠফরটগইঝঢজ4বডঃহতডফীঘ3গ্ংঢ়=ংযধৎরহম

তালিবুল ইলম ভাইয়েরা ‘ইখতিলাফে মাতালি’র এই শাস্ত্রীয় বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝার জন্য মুতালাআ করতে পারেন উস্তাযে মুহতারাম হযরত শাইখুল ইসলাম তকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর সহীহ বুখারীর দরসে তাকরীরের সংকলন ‘ইনআমুল বারী’ খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৪৯২-৪৯৪

এমনিভাবে হযরতের কিতাব ‘বুহুস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআছিরাহ’ খন্ড:২, পৃষ্ঠা:২৫৩-২৫৫

যাহোক, বিভিন্ন অঞ্চলের উদয়স্থল এক বা আলাদা হওয়ার এক অর্থ তো এই দাঁড়াল যে, জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব অনুসারে এক বা আলাদা হওয়া। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুই শহরকে এক উদয়স্থলের বা আলাদা উদয়স্থলের মনে করা। এ হিসাবে এমন প্রত্যেক অঞ্চলকে এক উদয়স্থলের গণ্য করা হবে, যেগুলো পরস্পর কাছাকাছি এবং সেগুলোতে চাঁদের তারিখও এক থাকে। আর যেখানে সাধারণত এমন হয় যে, চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার ক্ষেত্রে এক এলাকা অন্য এলাকা থেকে আগে বা পিছে থাকে এবং সেসকল অঞ্চলের লোকেরা নিজেদের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে আমল করলে দেখা যায় তাদের চান্দ্র তারিখে একদিনের পার্থক্য থাকে, তাহলে সেগুলোকে আলাদা উদয়স্থলের ধরা হবে।

نبه على أصل هذه النكتة في "تحفة الألمعي شرح سنن الترمذي" ج ٣ ص٦٥ وستعرف مأخذه من الفقه و الدليل إن شاء الله

উদয়স্থলের ভিন্নতা-অভিন্নতার এই সরল মাপকাঠি যা কোনো অংক বা যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই ব্যবহারযোগ্য। এর আলোকে পরস্পর কাছাকাছি শহরগুলোকে অভিন্ন উদয়স্থলের মনে করা হয়, যদিও জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব অনুসারে এগুলোর কোনোটি নতুন চাঁদ দর্শনের আওতার বাইরে থাকে। তদ্রূপ কোনো বড় শহর যদি এমন হয় যে, ঘটনাচক্রে কোনো মাসে তার কোনো অংশ ঐ আওতার বাইরে থেকে যায় তাহলে জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব অনুসারে ঐ অংশের উদয়স্থল আলাদা হলেও সাধারণ পরিভাষায় গোটা শহরের উদয়স্থল অভিন্ন বলা হবে। অতএব উদয়স্থলের ভিন্নতা-অভিন্নতার দ্বিতীয় অর্থ এই হল যে, সাধারণ ধারণা ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে দুই অঞ্চলের উদয়স্থল এক বা আলাদা হওয়া।

এখন দেখার বিষয় এই যে, হানাফী ও শাফেয়ী ফকীহগণের যারা কাছের শহর ও দূরের শহরের মাঝে পার্থক্য করেছেন উদয়স্থলের ভিন্নতা বা অভিন্নতার ভিত্তিতে তারা উদয়স্থল বিভিন্ন হওয়ার কী অর্থ গ্রহণ করেছেন- জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব ভিত্তিক ভিন্নতা না সাধারণ ধারণা ও অভিজ্ঞতার ভিন্নতা। তাকীউদ্দীন সুবকী রাহ., ইবনে হাজার মক্কী রাহ. এবং সমকালীন দু একজন আলিমের কথা থেকে যদিও অনুমিত হয় যে, তাঁরা উদয়স্থলের ভিন্নতা-অভিন্নতার জ্যোতির্শাস্ত্রীয় অর্থ বুঝেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহর বক্তব্য ও তার পূর্বাপর মনোযোগ সহকারে পড়লে জানা যায় যে তারা এ অর্থ নয় বরং দ্বিতীয় অর্থ হিসাবে এ শব্দ ব্যবহার করেছেন। জ্যোতির্শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে উদয়স্থলের যে ভিন্নতা-অভিন্নতা সেটা তাদের উদ্দেশ্য নয়।

এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে যদি নীচের বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করা যায় :

১. প্রথম কথা এই যে, কোনো কোনো ফকীহ তো একদম পরিষ্কার ভাষায় উদয়স্থলের ভিন্নতার এ সাধারণ অর্থই বর্ণনা করেছেন যেমন আল্লামা জামালুদ্দীন ইউসুফ ইবনে ইবরাহীম আরদাবীলী শাফেয়ী রাহ. (৭৭৯ হি.আনুমানিক) লেখেন-

وإذا رؤي الهلال في بلدة ولم ير في أخرى فإن تقاربا فحكمهما واحد، وإن تباعدا فلا، والضبط بمسافة القصر، وقيل باختلاف المطالع، وهو أن يتباعد البلدان بحيث لو رؤي في أحدهما لم ير في الآخر غالبا.

এখানে তিনি পরিষ্কার বলেছেন, উদয়স্থল আলাদা হওয়ার অর্থ, দুই শহর পরস্পর এত দূরের হওয়া যে, এক শহরে নতুন চাঁদ দেখা গেলে দ্বিতীয় শহরে সাধারণত দেখা যায় না। (দেখুন : আল্লামা আরদাবীলীর কিতাব ''আলআনওয়ার লি আমালিল আবরার'' খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩০৬, দারুযযিয়া, কুয়েত ১৪২৭ হি.)

এ শুধু আরদাবীলীর কথা নয়, এর কাছাকাছি কথা তার অনেক আগে লিখেছেন আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে আহমদ আসসারাখসী (৪৯৪ হি.), যিনি আবুল ফারাজ আযযায নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। এই সারাখসী ছিলেন ফিকহে শাফেয়ীর হাফিয।

শাফেয়ী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ইমামদের মধ্যে তিনি গণ্য। সামআনী রাহ. লিখেছেন যে, তাঁর 'আমালী' খুবই সমাদৃত (মুতালাক্কা বিল কবুল) গ্রন্থ। (তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা, তাজুদ্দীন সুবকী খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১০১-১০৪; তাহযীবুল আসমা, নববী খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭৬৬; সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবী খন্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ২০৫)

ইমাম নববী রাহ. ''শরহুল মুহাযযাব'' গ্রন্থে তার প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কখনো শুধু ''আসসারাখসী'' বলে, কখনো তাঁর কিতাব ''আলআমালী''র উল্লেখ সহকারে। উদয়স্থলের ভিন্নতা প্রসঙ্গে নববী রাহ. তাঁর বরাতে লিখেছেন-

"قال السرخسي : إذا رآه أهل ناحية دون ناحية، فإن قربت المسافة لزمهم كلهم.

وضابط القرب أن يكون الغالب أنه إذا أبصره هؤلاء لا يخفى عليهم إلا لعارض، سواء في ذلك مسافة القصر أو غيرها.

قال : فإن بعدت المسافة فثلاثة أوجه :

أحدها : يلزم الجميع، واختاره أبو علي السِّنْجِيْ.

والثاني : لا يلزمهم

والثالث : إن كانت المسافة بينهما بحيث لا يتصور أن يرى ويخفى على أولئك بلا عارض، لزمهم، وإن كانت بحيث يتصور أن يخفى عليهم فلا".

(আলমাজমূ খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪২৮-৪২৯)

এ বর্ণনায় আবুল ফারাজ সারাখসী রাহ. কাছের শহরের মাপকাঠি বর্ণনা করে বলেছেন, যেখানে দূরত্ব এ পরিমাণ হয় যে, এক জায়গায় চাঁদ দেখা গেলে সাধারণত অন্য জায়গায়ও দেখা যায় তা কাছের। আর যেখানে দূরত্ব এ পরিমাণ যে, এক জায়গায় চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার দ্বারা অন্য জায়গায় দৃষ্টিগোচর হওয়া জরুরি নয়; বরং চাঁদ ঐ শহরের অধিবাসীদের দৃষ্টির আড়ালে থাকার সম্ভাবনা আছে, তা দূরের শহর গণ্য করা হবে।

২. শায়খ আবু হামেদ আসফারাইনী ও ইবনুস সাববাগসহ অনেক ফকীহ অভিন্ন উদয়স্থলের ও আলাদা উদয়স্থলের শহর-নগরের কিছু উদাহরণও উল্লেখ করেছেন। যেমন তাঁরা কূফা ও বাগদাদ বা বসরা ও বাগদাদকে এক উদয়স্থলের আর হিজায ও ইরাক এবং শাম ও খোরাসানকে আলাদা উদয়স্থলের ধরেছেন। তাঁদের চিন্তায় যদি উদয়স্থলের জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবভিত্তিক অভিন্নতা ও ভিন্নতা থাকত তাহলে প্রথমত সুনির্দিষ্টভাবে সবসময়ের জন্য কিছু অঞ্চলকে এক উদয়স্থলের আর কিছু অঞ্চলকে আলাদা উদয়স্থলের সাব্যস্ত করতেন না। দ্বিতীয়ত ইরাক ও হিজায এবং শাম ও খোরাসানকে তারা পরস্পর ভিন্ন উদয়স্থলের হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অথচ জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকে দেখা যায় প্রায় সময় এগুলোর উদয়স্থল একই থাকে। কোনো মাসে হয়তো উভয় শহর থেকেই চাঁদ দেখা সম্ভব নয়। আবার কোনো মাসে উভয় শহর থেকেই দেখা সম্ভব। কখনো ব্যতিক্রমও হয়। পিছনে যে লিংকগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলোতে পরিবেশিত বিভিন্ন মাসের চাঁদ দেখার নকশাগুলো দেখলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

তাহলে জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবের দিক থেকে যখন এই শহরগুলো সাধারণত একই উদয়স্থলের হয়ে থাকে ফকীহগণ এগুলোকে ভিন্ন উদয়স্থলের বললেন কীভাবে? বুঝা গেলো, উদয়স্থলের ভিন্নতা বলতে তারা শাস্ত্রীয় ভিন্নতা বুঝান না।

এই ধারণা ঠিক নয় যে, আগের যুগের আলিমগণ জ্যোতির্শাস্ত্রীয় ভিন্নতা-অভিন্নতা সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন। তাই তাঁরা এসব উদাহরণ দিয়েছেন। এ ধারণা এজন্য ঠিক নয় যে, আমাদের পূর্ববর্তী ফকীহগণ 'ইলমে হাইয়াত' ও 'ফালাকিয়াত' (প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা) সম্বন্ধে মোটেও বেখবর ছিলেন না। কারো কারো নিশ্চয়ই এ শাস্ত্র জানা ছিল না, কিন্তু অনেকেই ছিলেন ফালাকিয়াত-এর আলিম।

ইমাম গাযালীর উস্তায ইমামুল হারামাইন আবদুল মালিক ইবনুল জুয়াইনী (৪১৯-৪৭৮ হি.) ''নিহায়াতুল মাতলাব'' গ্রন্থে পরিষ্কার লিখেছেন যে,্সফরের দূরত্বের কম দূরত্বেও উদয়স্থল আলাদা হতে পারে এবং উদয়স্থলের প্রকৃত ভিন্নতা সম্পর্কে অবগতি খুবই সূক্ষ্ম বিষয়, যা শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরাই বুঝতে পারে। বলাবাহুল্য, এ জাতীয় বিষয়ের উপর শরীয়তের বিধান নির্ভরশীল হয় না। এ কারণে নিকট ও দূরের পার্থক্যের ক্ষেত্রে (শাস্ত্রীয়) ভিন্নতা মানদন্ড হতে পারে না। আর কেউ একে মানদন্ড বলেনওনি''।

তাঁর আরবী বক্তব্য এই-

وذكر الأصحاب : أن البعد الذي ذكرناه هو مسافة القصر، ولو اعتبر مسافة يظهر في مثلها تفاوت المناظر في الاستهلال لكان متجها في المعنى، ولكن لا قائل به. (১)

فإن درك هذا يتعلق بالأرصاد والنموذارات الخفية، وقد تختلف المناظر في المسافة القاصرة عن مسافة القصر، للارتفاع والانخفاض، والشرع لم يُبنَ على التزام أمثال هذا، ولا ضبط عندنا وراء مسافة القصر للبعد. (نهاية المطلب في دراية المذهب ج ٤ ص ١٧)

তো জানা গেল যে, অতীতের ফকীহগণ উদয়স্থলের জ্যোতির্শাস্ত্রীয় ভিন্নতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এরপর তাদের আলোচনা ও উদাহরণ যখন এর সাথে মেলে না তখন কি প্রমাণ হয় না যে, তাদের উদ্দেশ্য সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিন্নতা?

৩. হানাফী ফকীহগণের আলোচনাতেও বেশ স্পষ্টভাবেই বলা আছে যে, তাদের উদ্দেশ্য উদয়স্থলের জ্যোতির্শাস্ত্রীয় ভিন্নতা নয়।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রশীদ আলকিরমানী (৫৬৫ হি.) ''জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া''য় যখন এ মাসআলা উল্লেখ করেন যে, ৩০ ওয়ালাদের চাঁদ দেখার ইতিবার করে ২৯ ওয়ালাদেরকে যে এক রোযা কাযা করার কথা বলা হয়েছে এটা ঐ সময় যখন উভয় অঞ্চলের উদয়স্থল এক হবে। উদয়স্থল আলাদা হলে একের বিধান অন্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

এ মাসআলা উল্লেখ করার পরই তিনি তাঁর উস্তায ইমাম জামালুদ্দীন ইয়াযদী থেকে একটি নোট নকল করেছেন-

قال شيخنا وسيدنا جمال الدين : لم يذكروا في ذلك حدا، بل أطلقوا، وأنا أقول : يجوز أن يعتبر فيه ما يعتبر في الغيبة المنقطعة في حق الولي.

قلت له : تحديدك في الغيبة المنقطعة لا يوجب زيادة في البيان، فإنهم اختلفوا فيها.

قال : ما لا يصل القوافل في السنة غالبا إلا مرة، وأقله مسيرة شهر، ألا يرى إلى قصة سليمان بن داود : "ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر".

وكان انتقاله من إقليم إلى إقليم، وقدره بشهر، فعرف أن بين الإقليمين لا يكون أقل من شهر. ولا يمكن الاعتماد على ما يقول المنجمة من زيادة الدرجة في العرض والطول، فلا يعتبر.

ইমাম জামালুদ্দীন ইয়াযদী হানাফী রাহ. এখানে পরিষ্কার বলেছেন যে, উদয়স্থল এক বা আলাদা হওয়ার ক্ষেত্রে (শরয়ী হুকুমের জন্য) অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ এর হিসাব গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, তাহলে উদয়স্থলের অভিন্নতা বা ভিন্নতার মাপকাঠি কী? তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমাদের ফকীহগণ বিশেষ কোনো সীমারেখা উল্লেখ করেননি। তবে তার মতে কিছু আলামতের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এক মাসের দূরত্ব হলে তা আলাদা উদয়স্থলের শহর। (দ্রষ্টব্য : ''জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া'' (মাখতূতাত) কিতাবুস সওম, আলবাবুছ ছানী।)

তিনি উদয়স্থলের ভিন্নতার যে সীমা উল্লেখ করেছেন তা স্পষ্টতঃ একটি আনুমানিক সীমা। তবে তাঁর বর্ণনা থেকে দু'টো বিষয় স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে :

ক. যে হানাফী ফকীহগণ ভিন্নতাকে মাপকাঠি সাব্যস্ত করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্য জোতির্বিদ্যার হিসাবভিত্তিক সূক্ষ্ম ও সুনির্দিষ্ট ভিন্নতা নয়। এ কারণে পরের ফকীহগণকে এর কোনো আনুমানিক মাপকাঠি খুঁজতে হয়েছে।

খ. আলোচনার শেষের দিকে ইমাম জামালুদ্দীন ইয়াযদী রাহ. পরিষ্কার বলেছেন যে, ফিকহ শাস্ত্রের পরিভাষায় উদয়স্থলের যে ভিন্নতা তা জ্যোতির্শাস্ত্রীয় ভিন্নতা নয়। ইমাম রুকনুদ্দীন আলকিরমানী তা বর্ণনা করে মৌনতা অবলম্বন করেছেন।(২)

তো আমাদের ফকীহগণের কাছেও উদয়স্থলের ভিন্নতা অর্থ জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবভিত্তিক ভিন্নতা নয়; বরং সাধারণ অভিজ্ঞতাভিত্তিক ভিন্নতাই উদ্দেশ্য, যার আনুমানিক পরিমাণ ঐ যুগের বিচারে বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. সবচেয়ে বড় কথা এই যে, চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে শরীয়ত গোড়া থেকেই জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবকে মানদন্ড বানায়নি; বরং উম্মতের সহজতার জন্য চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এমন মানদন্ড নির্ধারণ করেছে, যা সবযুগে সব অঞ্চলে সহজে অনুসরণযোগ্য। আর তা হচ্ছে চাঁদ দেখা বা চাঁদ দেখার সাক্ষ্য। আর কোনো কারণে চাঁদ না দেখা গেলে ৩০ দিন পূর্ণ করার আদেশ দিয়েছে। অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত এবং খাইরুল কুরূন (সাহাবা-যুগ, তাবিয়ীন-যুগ ও তাবে-তাবিয়ীন যুগ)-এর উলামা-ফুকাহার এ বিষয়ে ইজমাও রয়েছে যে, চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাব ধর্তব্য নয়। যদিও খাইরুল কুরূন অতিবাহিত হওয়ার পর দু-চারজন আলিম বিশেষ অবস্থায় বিশেষ শর্ত-শারায়েতের সাথে জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবের দিক থেকে চাঁদ দর্শনযোগ্য হওয়াকেও যথেষ্ট মনে করেছেন, কিন্তু তাদের এ মতভিন্নতা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও অগ্রহণযোগ্য মতভিন্নতা। সহীহ হাদীসসমূহের স্পষ্ট বক্তব্য ও খাইরুল কুরূনের ইজমার বিপরীতে এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

তো যখন চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে গোড়া থেকেই জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবকে মানদন্ড বানানো হয়নি তখন নিকট ও দূরের পার্থক্যের ক্ষেত্রে জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবভিত্তিক নির্ধারিত 'ইখতিলাফে মাতালি' (উদয়স্থলের বিভিন্নতা)কে কীভাবে মানদন্ড বানানো যায়?

কোনো অঞ্চলের চাঁদ দেখা ঐ অঞ্চল থেকে দূর-দূরান্তের শহর-নগরে অবশ্য-অনুসরণীয় হবে কি না-এ বিষয়ে মতভিন্নতা খাইরুল কুরূন থেকে চলে আসছে এবং প্রত্যেক অঞ্চল ও প্রত্যেক মাযহাবে তা স্বীকারকারী ও অস্বীকারকারী ফকীহবৃন্দ আগেও ছিলেন, এখনো আছেন। তো এ বিষয়ে যদি জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবের বিচারেই নিকট দূরের পার্থক্য করার হুকুম হত তাহলে খাইরুল কুরূন থেকেই এর উপর আমল থাকত এবং বিচারকদেরকে, যারা চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার ফয়সালা কার্যকর করেন, এ বিষয়ে জ্যোতির্শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হওয়ার আদেশ করা হত। অথচ আমাদের জানা মতে উম্মাহর ইতিহাস ও হাজার বছরের কর্ম-ধারায় এর কোনো প্রমাণ নেই।

মোটকথা, বিভিন্ন দিক থেকে পরিষ্কার যে, ফকীহগণের যে বড় জামাত, উদয়স্থলের ভিন্নতাকে মানদন্ড বানিয়েছেন, এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিন্নতা। জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবভিত্তিক সূক্ষ্ম ভিন্নতা নয়।(৩)

এটা এজন্যও উদ্দেশ্য না হওয়া উচিত যে, জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবে উদয়স্থলের অভিন্নতার ভিত্তি চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনাকে বানানো হয় এবং যত অঞ্চলে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা আছে গোটা অঞ্চলকে অভিন্ন উদয়স্থলের গণ্য করা হয়। অথচ দৃষ্টিগোচর হওয়ার 'সম্ভাবনা' দৃষ্টিগোচর হওয়াকে অনিবার্য করে না। আর বলাই বাহুল্য, ফিকহী হুকুমের সম্পর্ক চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সাথে, দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনার সাথে নয়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

নিকট ও দূরের পার্থক্যের বিষয়ে কাউকে কাউকে এ আপত্তি করতে শোনা যায় যে, নিকট ও দূরের মাঝে পার্থক্য করার কোনো মানদন্ড যখন কোনো স্পষ্ট আয়াত বা স্পষ্ট হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং ইজতিহাদের ভিত্তিতে

ফকীহগণ যে মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন তাতেও তাঁদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে এ থেকে বোঝা যায়, বাস্তবে নিকট ও দূরের মাঝে কোনো পার্থক্যই নেই। যে কোনো জায়গায় চাঁদ দেখা গেলেই তা সব জায়গার জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় হবে। নিকট ও দূরের বিধান যদি বাস্তবেই আলাদা হত তাহলে এর কোনো মানদন্ড শরীয়তের স্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হত।

প্রশ্নটি অমূলক। কারণ শরয়ী দলিল দ্বারা প্রমাণিত কোনো বিষয়কে শুধু এজন্য অস্বীকার করা যে, এর বিস্তারিত বিবরণ স্পষ্ট নসে উল্লেখ নেই, সঠিক নয়। এর দ্বারা একদিকে যেমন শরয়ী দলিলকে রদ করা হয় অন্যদিকে অনেক স্বীকৃত ফিকহী বিধানকেও অস্বীকার অনিবার্য হয়, যেগুলোতে পরিমাণের ভিন্নতার কারণে বিধানের ভিন্নতা এসেছে অথচ পরিমাণটি 'মানসূস আলাইহি' (স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত) নয়; বরং ইজতিহাদী ও ইখতিলাফী। যেমন :

১. পানিতে নাপাকি পড়লে পানি নাপাক হবে কি না?

নাপাকির কারণে যদি পানির বৈশিষ্ট্যগুলোর (বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ) কোনোটি পরিবর্তিত হয় তখন তা সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক, কিন্তু যদি এ পরিমাণ নাপাকি না পড়ে তাহলে কী হুকুম? এ বিষয়ে অধিকাংশ ফকীহের মাসলাক এই যে, ওঅল্প' পানি নাপাক হয়ে যাবে, কিন্তু 'বেশি' পানি নাপাক হবে না। এখন প্রশ্ন হল, কী পরিমান পানি 'অল্প' পানি আর কী পরিমাণ পানি 'বেশি' পানি। যেহেতু এর মাপকাঠি কোনো সর্বসম্মত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় এ কারণে মুজতাহিদ ইমামগণের মাঝে এ বিষয়ে মতভেদ হয়েছে এবং এ বিষয়ে স্বয়ং ফিকহে হানাফীর ফকীহগণেরও বিভিন্ন মত আছে। মুতাআখখিরীন হানাফী ফকীহদের মাঝে 'দহ দর দহ' শীর্ষক মতটি অধিক প্রসিদ্ধ।

২. মুসাফিরকে চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে কসর করতে হয় এবং রোযা না রেখে পরে কাযা আদায়ের অবকাশ আছে, কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে 'সফরে'র সংজ্ঞা কী-এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ আছে। ফিকহে হানাফীতে এর যে ফয়সালা দেওয়া হয়েছে, আধুনিক পরিভাষায় তা হলো- ৭৭.২৪৮৫১২ কিলোমিটার।

তবে অন্যান্য মাযহাবের ফয়সালা এ থেকে আলাদা।

৩. মুসাফির কোথাও ইকামতের নিয়ত করলে তার উপর মুকীমের হুকুম প্রযোজ্য হয়। কিন্তু কতদিনের ইকামতের (অবস্থানের) নিয়ত করার দ্বারা মুকীম হয়-এ বিষয়ে মতভেদ আছে, ফিকহে হানাফীর 'মুফতাবিহী' সিদ্ধান্ত (ফতোয়া) এই যে, পনেরো দিন বা তার বেশি ইকামতের নিয়ত করলে মুকীম হবে।

৪. নামাযে 'আমলে কলীল' মাফ। অর্থাৎ এর কারণে নামায নষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে 'আমলে কাছীর' এর কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায়। এখন কোন কাজ 'আমলে কলীল' আর কোন কাজ 'আমলে কাছীর'-এর কোনো নির্ধারিত মাপকাঠি কোনো সুস্পষ্ট নস দ্বারা প্রমাণিত নয়। ফলে এ বিষয়ে ফকীহগণের সিদ্ধান্তও বিভিন্ন। ফিকহে হানাফীতে অগ্রগণ্য সিদ্ধান্ত এই যে, যে কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে দেখলে কেউ নামাযীই মনে করবে না; বরং নামাযের বাইরেই মনে করবে তা-ই 'আমলে কাছীর' যার দ্বারা নামায ফাসিদ হয়ে যাবে।(৪)

মোটকথা, শরয়ী দলিল দ্বারা প্রমাণিত কোনো বিষয়কে শুধু এজন্য অস্বীকার করা যে, এর বিস্তারিত প্রায়োগিক রূপ কোনো স্পষ্ট নসে নেই, মোটেও ঠিক নয়। কারণ স্পষ্ট নসে বিস্তারিত বিবরণ না থাকার অর্থ, বিষয়টিকে শরীয়ত

ফকীহগণের ইজতিহাদের উপর ন্যস্ত করেছে। অতএব এর সমাধান খুঁজতে হবে মুজতাহিদগণের কাছে। এ বিষয়ে যদি তাদের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন হয় তাহলে শরীয়তের নীতিমালার আলোকে আসহাবুত তারজীহ (অগ্রগণ্য নির্ধারণকারী) ফকীহগণ যে সিদ্ধান্তকে রাজিহ ও অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করবেন তা-ই অনুসরণ করা হবে। মাসআলাটি ইজতিহাদী বা ইখতিলাফী হওয়ার কারণে নিজের পক্ষ হতে মতামত দেওয়ার বা মুজতাহিদগণের সিদ্ধান্ত অস্বীকার করার অধিকার থাকবে না। আল্লাহ তাআলা যদি চাইতেন তাহলে প্রত্যেক বিষয়ের বিধান স্পষ্ট নসের দ্বারাও দিতে পারতেন, কিন্তু এ তার দয়া ও প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ যে, অনেক বিষয়কে মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতিহাদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। জ্ঞানীরা জানেন, এটি ইসলামী শরীয়তের 'মাহাসিন' সৌন্দর্যের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

আলোচ্য বিষয়ে 'আসহাবুত তারজীহ' ফকীহগণের বরাতে বলা হয়েছে যে, রাজিহ ও অগ্রগণ্য মত অনুসারে উদয়স্থলের ভিন্নতাই হচ্ছে মাপকাঠি এবং বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতির মাধ্যমে এ-ও বলা হয়েছে যে"ইখতিলাফুল মাতালি'' (উদয়স্থলের ভিন্নতা) অর্থ, সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিন্নতা, জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবভিত্তিক সূক্ষ্ম বিভিন্নতা নয়।

পুনশ্চঃ

প্রকৃত ঐক্য কী?

প্রকৃত ঐক্য এই নয় যে, মুসলমানদের রোযা ও ঈদ একই তারিখে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল; বরং প্রকৃত ঐক্য হচ্ছে :

১. গোটা উম্মত খালিস তাওহীদের উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

২. গোটা উম্মত আল্লাহর বিধানসমূহ পালন করতে থাকা।

৩. গোটা উম্মত সুন্নতে নববীর অনুসরণ ও উসওয়ায়ে হাসানা মোতাবেক জীবন গঠনে সচেষ্ট হওয়া।

৪. গোট উম্মত ইজমায়ী বিষয়সমূহে ইজমার উপর অটল অবিচল থাকা এবং ইজতিহাদী ও ইখতিলাফী বিষয়ে নিজের ইমাম, মুফতী বা মুরশিদের নির্দেশিত পন্থায় আমল করা এবং অন্যদের পথ ও পন্থার উপর আপত্তি ও সমালোচনা থেকে বিরত থাকা।

মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান জালালাবাদীর ভাষায় :

.اپنے مسلك كو چھوڑے نہیں اور دوسرے کے مسلك كو چھیڑے نہیں

নিজের পথ ছাড়বে না, অন্যের পথকে 'ছুঁড়বে না'।

৫. গোটা উম্মতের মাঝে প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হওয়া এবং ভালো কাজে সহযোগিতা আর জুলুম ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা পরিহারের প্রেরণা জাগ্রত হওয়া।

এই উম্মতের এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তাওহীদ ও ঈমান এবং ঈমানী ভ্রাতৃত্বের উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

রাবেতাতুল আলামিল ইসলামী-এর ‘আলমাজমাউল ফিকহিল ইসলামী’ (রাবেতার ফিকহী বোর্ড)-এর ফেব্রুয়ারি **১৯৮১** ঈ.-এ গৃহীত সিদ্ধান্তের বাক্যগুলো এই :

لا حاجة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي، لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم، كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد. وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاة في الدول الإسلامية، لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة، وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها، هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم.

মুসলিম জাহানে চাঁদ ও ঈদ এক করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ তা মুসলিমদের ঐক্য নিশ্চিত করবে না যেমনটা চাঁদ ও ঈদ এক করার অনেক প্রস্তাবকের ধারণা। চাঁদ প্রমাণ হওয়ার বিষয়টি ইসলামী দেশগুলোর কাযা ও ফতোয়া বিভাগগুলোর উপর ছেড়ে দেওয়াই সমীচীন। কারণ এটিই ইসলামের, সাধারণ কল্যাণ বিবেচনায় অধিকতর উত্তম ও উপযোগী।

আর যে বিষয়টি উম্মাহর ঐক্য নিশ্চিত করবে তা হচ্ছে, সকল বিষয়ে আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার বিষয়ে সবাই ঐক্যবদ্ধ হওয়া।” (কারারাতুল মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, মক্কা মুকাররমা, পৃষ্ঠা : ৮৭-৮৯)

রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর ‘আলমাজমাউল ফিকহী”-এর ঐ অধিবেশনে, যাতে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, পুরো বিশ্বের এবং সকল মাযহাবের বড় বড় ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। সিদ্ধান্তে যাঁদের সাক্ষর রয়েছে তাঁদের নাম এই :

১. عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ বিন বায)

২. محمد علي الحركان (نائب رئيس)

(মুহাম্মাদ আলী আলহারকান (উপপ্রধান)

৩. عبد الله بن محمد بن حميد (رئيس)

(আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদ (প্রধান)

৪. مصطفى الزرقاء

(মুস্তফা আযযারকা)

৫. محمد محمود الصواف

(মুহাম্মাদ মাহমুদ আসসাওয়াফ)

৬. محمد بن عبد الله بن سبيل

(মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সুবাইয়্যিল)

৭. صالح بن عثيمين

(সালেহ ইবনে উছাইমিন)

৮. مبروك العوادي

(মাবরুক আলআওয়াদী)

৯. محمد الشاذلي النيفر

(মুহাম্মাদ আশশাযেলী আননাইফার)

১০. عبد القدوس الهاشمي

(আবদুল কুদ্দুস হাশেমী)

১১. محمد رشيدي

(মুহাম্মাদ রশীদী)

১২. أبو الحسن علي الندوي

(আবুল হাসান আলী নদবী (দস্তখতের সময় উপস্থিত ছিলেন না।)

১৩. أبو بكر محمد جومي

(আবু বকর মুহাম্মাদ জুমী)

১৪. حسنين محمد مخلوف

(হাসানাইন মুহাম্মাদ মাখলূফ)

১৫. محمد رشيد قباني

(মুহাম্মাদ রশীদ কববানী)।

তো একই দিন রোযা ও ঈদ করার উপর উম্মতের ঐক্য নির্ভরশীল মনে করা বা এ ধারণা করা যে, এছাড়া উম্মাহর ঐক্য ও সম্প্রীতি অর্জিত হতেই পারে না-একটি অপরিণত চিন্তা। না এর কোনো দালীলিক ভিত্তি আছে, না সালাফের জীবনের সাথে এর কোনো সম্পর্ক আছে। এ তো খুব সহজেই বোধগম্য যে, বিষয়টি যদি শরীয়তের মাকাসিদের অন্তর্ভুক্ত হত তাহলে সালাফে সালেহীন নিজ নিজ যুগের প্রচার ও যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে এক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন। কিন্তু নবী-যুগের পর শত শত বছর পর্যন্ত এর কোনো দৃষ্টান্ত ইসলাম ও মুসলমানের ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

দারুল খিলাফায় (রাজধানীতে) চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার পর এর সংবাদ দূত মারফত মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে পৌঁছানো যেত। ঈদুল আযহা, আশূরা, লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান ইত্যাদি ক্ষেত্রে তো খুব সহজেই তা সম্ভব হত; ঈদুল ফিতরেও সময়ের পরে হলেও রাজধানীর ঈদ সম্পর্কে অবগত করা যেত, যাতে অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরাও প্রকৃত ২৯ রমযান ও প্রকৃত ১ লা শাওয়াল সম্পর্কে অবগত হয় এবং এক দুইটি রোযা কাযা করতে হলে তা তারা জানতে পারেন। কিন্তু খাইরুল কুরূনে বা পরবর্তী কোনো যুগেও কি মুসলিম আমীরগণ বা উলামা ও ইমামগণ এরূপ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? এ প্রসঙ্গে নির্ভরোযগ্য একটি উদাহরণও কি পেশ করা যাবে?

ঐ যুগে কেন তাঁরা শুধু নিজ এলাকায় চাঁদ খুঁজতেন। ২৯ শাবান সকালে কি চারদিকে দূত পাঠানো যেত না? যারা চাঁদ দেখত, (চাঁদের শাহাদাত নিয়ে দ্রুত রওয়ানা হত, কেউ হয়তো ইশার পর, কেউবা সুবহে সাদিকের আগে এসে পৌঁছত। কিন্তু সম্ভাব্য পর্যায় পর্যন্ত অন্যান্য অঞ্চলের চাঁদের সংবাদ তো মিলে যেত। এর কোনো দৃষ্টান্ত কি পাওয়া যায় নবী-যুগে, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে? কিংবা খাইরুল কুরূন বা তারপরে ইসলামী খিলাফতের দীর্ঘ সময়ের ইতিহাসে?

তদ্রূপ ২৯ রমযানেও চারদিকে দূত পাঠানো সম্ভব ছিল কিন্তু তা-ও করা হয়নি। হাদীস-সীরাতে যে দৃষ্টান্ত আছে তা হচ্ছে, ৩০ রমযান সন্ধ্যায় ঘটনাক্রমে একটি কাফেলা সফর থেকে ফিরল এবং চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিল। তখন রোযা ভাঙ্গার এবং পরের দিন ঈদ কাযা করার আদেশ এল কিন্তু কখনো কি এমন চিন্তা করা হয়েছে যে, কাফেলা এসে কেন আমাদের সংবাদ দিবে, আমরাই কেন আগে চারদিকে দূত পাঠাই না কিংবা আগে থেকেই পত্র লিখে অন্যান্য অঞ্চলের দায়িত্বশীল ও গভর্ণরদের জানিয়ে দেই না যে, যেখানেই চাঁদ দেখা যাবে অবশ্যই যেন চারদিকে দূত পাঠিয়ে এ সংবাদ পৌঁছে দেয়া হয়?

আপনি হয়তো বলবেন, এটা কষ্টসাধ্য ছিল, কিন্তু শুধু কষ্টের কারণে কি সাহাবা-তাবেয়ীন শরীয়তের কোনো কাম্য বিষয় ত্যাগ করতে পারেন? তারা তো সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত নিজেদের দায়িত্ব পালন করতেন। অতপর অসীয়ত করে যেতেন যে, তোমাদের পক্ষে আরো বেশি করা সম্ভব হলে তাতেও কোনো ত্রুটি করবে না। প্রশ্ন এই যে, সালাফের সীরাতে এই 'পূণ্যকর্মের' কোনো দৃষ্টান্ত (ঐ যুগে যতদূর সম্ভব ছিল) কেন পাওয়া যায় না?

ইতিহাসে নবী-যুগ ও খিলাফত আমলের রাজনৈতিক ফরমানসমূহ সংরক্ষিত রয়েছে। সেগুলো এক এক করে পাঠ করা হোক এবং একটি ফরমানই বের করে আনা হোক, যাতে দারুল খিলাফা বা হরমে মক্কা বা হরমে মদীনার চাঁদ সাব্যস্ত হওয়ার সংবাদ অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য লেখা হয়েছে। যাতে তারা ঐ চাঁদের ভিত্তিতে যথাসময়ে বা সময়ের পরে তাদের করণীয় সম্পন্ন করতে পারেন।

আমাদের জানামতে, এরূপ একটি দৃষ্টান্তও নেই। এর বিপরীতে এমন ফরমান পাওয়া যাবে, যাতে খলীফাতুল মুসলিমীন অন্য এলাকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ হাদীস লিখে পাঠিয়েছেন : 'মাস (কখনো) ঊনত্রিশে হয় তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা ছাড়বে না। তবে যদি চাঁদ ঢাকা পড়ে যায় তাহলে তা (ত্রিশটি) হিসাব করে নাও'।- সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২৩১৫; সুনানে বায়হাকী ৪/২০৪)

এর অর্থ এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীগণ নিজ নিজ চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করবেন।

এ কারণে এই মত ও চিন্তা অবশ্যই বর্জণীয় যে‘তাওহীদুল আহিল্লাহ’ তথা এক চাঁদভিত্তিক রোযা ও ঈদ করা শরীয়তের মাকাসিদ ও উদ্দেশ্যাবলির অন্তর্ভুক্ত কিংবা উম্মাহর ঐক্য এ ছাড়া অসম্পূর্ণ থাকবে। দৃষ্টিভঙ্গির সংশোধনের পর রোযা ও ঈদ একই দিনে করার বিষয়ে নিছক জযবা ও আবেগের পরিবর্তে দলীল ও বাস্তবতার আলোকে চিন্তা করা উচিত যে, প্রকৃতপক্ষেই এর গুরুত্ব কতটুকু আর তা বাস্তবায়নই বা কত দূর সম্ভব?

মূল বিভ্রান্তি : ইখতিলাফুল মাতালি’ প্রসঙ্গ

যারা গোটা দুনিয়ায় একই সাথে রোযা শুরু ও একই দিনে ঈদ করাকে শরীয়তের হুকুম এবং ফরয দরজার হুকুম মনে করেন তাদের অনেকেরই ‘ইখতিলাফে মাতালি’ বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

‘ইখতিলাফুল মাতালি’ একটি প্রসিদ্ধ শিরোণাম, যার সারকথা এই যে, এটা তো এক অকাট্য ও চোখে দেখা বাস্তবতা যে, গোটা পৃথিবীর জন্য চাঁদের মাতলা (উদয়স্থল) অভিন্ন নয়, বিভিন্ন। অর্থাৎ চাঁদ যখন ‘হেলাল’ আকারে প্রথম দৃষ্টিগোচর হয় তখন সম্ভব নয় যে, একই রাতে তা গোটা পৃথিবীবাসীর দৃষ্টিগোচর হবে। বরং উদাহরণস্বরূপ, কোথাও ২৯ তারিখ সন্ধ্যায় দৃষ্টিগোচর হবে, কোথাও ৩০ তারিখ সন্ধ্যায়। তাহলে ‘হিলালে’র (নতুন চাঁদের) ‘ মাতলা’ (উদয়স্থল) বা ‘তুলূ’ (উদয়) এক নয়, বিভিন্ন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, রোযা শুরু করার ও ঈদ করার ক্ষেত্রে এই বিভিন্নতা বিবেচনা করা হবে কি না। বিবেচনা করার অর্থ হবে, প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীগণ নিজ নিজ চাঁদ দেখার উপর আমল করবে। ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ একে لكل أهل بلد رؤيتهم শিরোনামে উল্লেখ করেন অর্থাৎ প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য তাদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য। দূর দরাজের কোনো এলাকা থেকে চাঁদ দেখার প্রমাণ পাওয়া গেলেও তা গ্রহণ করা জরুরি নয় বা গ্রহণ করা দুরস্ত নয়।

আর উদয়স্থলের বিভিন্নতাকে বিবেচনা না করার অর্থ এই যে, দূর দূরান্তের কোনো অঞ্চল থেকেও যদি চাঁদ দেখার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে তা গ্রহণ করা যায়, বা গ্রহণ করা জরুরি। একে পরবর্তী ফিকহের কিতাবগুলোতে لا عبرة لاختلاف المطالع শিরোনামে উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ বিধানের ক্ষেত্রে উদয়স্থলের বিভিন্নতাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তারা বাস্তবে উদয়স্থলের বিভিন্নতাকে অস্বীকার করেন। তাদের উদ্দেশ্য, বিধানের ক্ষেত্রে একে বিবেচনা করা হয় না।

ফিকহ ও হাদীসের কিতাবে এ বিষয়টির প্রাচীন শিরোণাম হচ্ছে‘এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য দলীল কি না’। পরবর্তীগণ একে ‘উদয়স্থলের বিভিন্নতা বিবেচ্য হওয়া, না হওয়া’ শব্দে উল্লেখ করেছেন। বিষয়ের স্বরূপ ও তাতে মতভেদের ধরন হিসেবে পুরানো শিরোনামটিই অধিক সূক্ষ্ম। যদিও এখন দ্বিতীয় শিরোনাম অধিক প্রসিদ্ধ।

তো এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের লোকদের জন্য বিবেচ্য কি না এটা তো মতভেদপূর্ণ ও ইজতিহাদ-নির্ভর বিষয়। কোন দিকে রায় বেশি এবং কোন মতটি দলীলের বিচারে অধিক শক্তিশালী এর বাস্তবজ্ঞান তো কম মানুষেরই আছে, তবে এ কথাটি মুখে মুখে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, শাফেয়ী মাযহাব ছাড়া অন্য সকল মাযহাবের

সিদ্ধান্ত, কোনো এক স্থানে চাঁদ দেখা গেলে যেখানে যেখানে এর প্রমাণ পৌঁছবে সেখানে ঐ চাঁদ দেখা অনুযায়ী আমল করা ফরয হয়ে যাবে।

তো অনেকে এই কথাটি নিয়েই ছুটলেন এবং ফতোয়া দিতে লাগলেন যে, সৌদীতে চাঁদ দেখার খবর রেডিও-টিভিতে প্রচারিত হলে সকল অঞ্চলের মুসলমানের নিজ উদ্যোগেই সে অনুযায়ী আমল করা জরুরি। তাদের দেশে নির্ভরযোগ্য ও সরকারী কোনো হেলাল কমিটি থাকলেও। এভাবে পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চল থেকে চাঁদ দেখার কোনো সংবাদ প্রচারিত হলে সকল অঞ্চলে সে অনুসারে আমল করা জরুরি। অথচ যে ফকীহগণ বলেছিলেন, এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্যও প্রযোজ্য তাদের কথার অর্থ এই ছিল যে, এলাকার ভিন্নতা চাঁদ দেখার সাক্ষ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে না। বাকি এক এলাকারর চাঁদ দেখা অন্য এলাকায় আমলযোগ্য হওয়ার জন্য কী কী শর্ত আছে, এবং তা বাস্তবায়নের পদ্ধতি কী-এটা আলাদা প্রসঙ্গ, যা ফিকহের কিতাবে আলাদা শিরোনামে আলোচিত হয়ে থাকে। যার সারকথা হল‘তরীকে মূজিব’ দ্বারা চাঁদ দেখা প্রমাণিত হতে হবে। (অর্থাৎ এমন পদ্ধতিতে খবর বা সাক্ষ্যগুলো আসতে হবে যেভাবে এলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য এবং সে অনুযায়ী আমল অপরিহার্য হয়। এরপর তা সংশ্লিষ্ট অথরিটি (শাসক বা তার প্রতিনিধি)-এর পক্ষ হতে কার্যকর হতে হবে। অন্যথায় তা ‘ওয়াজিবুল আমল’ (অবশ্য অনুসরণীয়) হয় না। এটা ঐ আলিমদের নিকটেও, যারা উদয়স্থলের বিভিন্নতাকে অগ্রাহ্য করেন।

‘তরীকে মূজিব’-এর অনুসন্ধান ছেড়ে এবং সংশ্লিষ্ট অথরিটির পক্ষ হতে কার্যকর হওয়ার অপেক্ষা না করেই ‘কোথাও চাঁদ দেখার সংবাদ যে কোনোভাবে প্রচারিত হলেই সে অনুসারে আমল করা ফরয হবে’ এটা ঐ ভাইদের অপরিণত চিন্তা, যার সাথে ঐ সকল ইমাম বা আলিমগণের চিন্তার দূরতম সম্পর্কও নেই; যারা বলেছিলেন, এক এলাকায় চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্যও গ্রহণযোগ্য। তাদের উদ্দেশ্য শুধু এটুকু ছিল যে, অঞ্চলের বিভিন্নতা চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ নয়। তবে সে চাঁদ দেখা অন্য এলাকায় কখন কীভাবে আমলযোগ্য হবে তা এক আলাদা প্রসঙ্গ। এ তো সুস্পষ্ট যে, সেটা শরীয়তসম্মত পন্থায় হতে হবে। এর কোনো নীতি ও বিধান নেই, তা ঐ ইমামরা বলেননি। তো আমরা যদি ঐ ইমামদের মাযহাব অনুসরণ করতে চাই এবং এক এলাকার চাঁদ দেখা অনুসারে অন্য এলাকায় আমল করতে চাই তাহলে আমাদের এ সংক্রান্ত বিধিবিধান এবং সংশ্লিষ্ট নীতি ও ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে হবে। (সামনে ইনশাআল্লাহ এ বিষয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে।)

দ্বিতীয় কথা এই যে, ঐ ইমামগণ যদিও বলেছেন, এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলে ‘তরীকে মূজিব’ অনুযায়ী প্রমাণিত হলে সে অনুসারে (যথানিয়মে) আমল করা জরুরি হয়ে পড়ে, কিন্তু তাদের একজনও কি বলেছেন, এক এলাকার চাঁদ দেখার সংবাদ অন্য এলাকায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা এবং প্রাপ্ত খবর ও সাক্ষ্যগুলো যাচাই করে আন্তর্জাতিকভাবে তা কার্যকর করার ব্যবস্থা নেয়া ফরয? বলাবাহুল্য, এমন কথা না কোনো ইমাম বলেছেন, না কোনো আলিম; আর না কারো এমন কথা বলার অধিকার আছে। কারণ এ ধরনের ব্যবস্থা ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নত হওয়ার বিষয়ে শরীয়তের কোনো দলীল নেই, প্রথম থেকে ইমামগণের মাঝে যে মতভেদ চলে আসছে তা এই যে, যদি অন্য এলাকা থেকে চাঁদ দেখার সংবাদ ‘তরীকে মুজিবে’র সূত্রে পাওয়া যায় তবে তা গ্রহণ করা হবে কি না, কিন্তু এ বিষয়ে সকল ইমাম একমত যে, অন্য এলাকার চাঁদ দেখার সংবাদ সংগ্রহ করা কখনো জরুরি নয়। আর

শরীয়তের কোনো আদেশ ছাড়া তা জরুরিই বা হয় কীভাবে? হাদীসে এটা তো আছে যে, মদীনার বাইরে থেকে কেউ চাঁদের শাহাদাত দিলে শর্ত পাওয়া গেলে তা গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের জানামতে, এটা তো কোনো হাদীসেই নেই যে, ২৯ শাবানের সন্ধ্যায় বা পরদিন সকালে, তদ্রূপ ২৯ রমযানের সন্ধ্যায় বা পরদিন সকালে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর পরে কোনো খলীফায়ে রাশিদ মদীনার বাইরে দশ/বিশ মাইল দূরেও কাউকে চাঁদ দেখার জন্য বা চাঁদের শাহাদত সংগ্রহ করার জন্য পাঠিয়েছেন। তো যখন বাইরে থেকে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য তলব করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরি নয় তাহলে কীভাবে বলা যায়, সকল অঞ্চলে অবশ্যই এক চাঁদ দেখা অনুসারে আমল হওয়া শরীয়তের অভিপ্রায়?

যাই হোক, আমি আরজ করছিলাম, এই যে ভেবে নেয়া হয়েছে, যে ইমামগণ উদয়স্থলের বিভিন্নতাকে গ্রাহ্য করেন না তারা সবাই একথাও বলেন যে‘অন্য জায়গার সংবাদ কোনো বিধিবিধান বা কোনো নীতি ব্যবস্থা ছাড়াই গ্রহণ করা হবে’ কিংবা তাঁরা এ কথার প্রবক্তা যে‘সর্বত্র একই দিনে রোযা-ঈদ হওয়া জরুরি’ সম্পূর্ণ ভুল। জ্ঞান ও গবেষণার সাথে এসব চিন্তার দূরতম সম্পর্কও নেই।

—মাওলানা আবদুল মালেক দা. বা.